সাইয়িদ সুলাইমান নদবি

মুসলিম বিশ্ব ও উসমানি খেলাফত

কামরুল হাসান নকীব
অনূদিত

সাইয়িদ সুলাইমান নদবি

মুসলিম বিশ্ব ও উসমানি খেলাফত
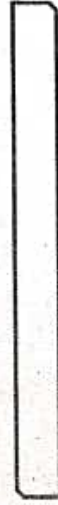
অনুবাদ
কামরুল হাসান নকীব

উৎসর্গনামা–
দাদা, দাদী, নানা ও আব্বার মাগফেরাত কামনায়

অনুবাদকের কথা

বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন ১৯২৬ সাল। উসমানি খেলাফতের পতনের দুই বছর পর। বক্ষ্যমাণ বইটির গুরুত্ব বোঝার জন্য এই সময়টাকে বোঝা নিতান্তই জরুরি। ১৯২৪ সালে উসমানিদের পতনের পর সারা বিশ্ব উসমানিদের নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। এই আলোচনায় খুব কম সংখ্যক মানুষই উসমানিদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের প্রতি সুবিচার করেছে। সময়ের সামান্য ব্যবধানেই উসমানিদের দীর্ঘ সাত শত বছরের গৌরবখচিত ইতিহাস মুসলিমদের হৃদয় থেকে ম্লান হতে থাকে। ইতিহাসের প্রতি এই চরম অবিচার ও অন্যায় যে কোন জাতির জন্য আত্মঘাতী ও আত্মনাশী।

বিজাতিক সাম্রাজ্যবাদী ও ক্রুসেডাররা বিভিন্ন সময়ে সুচতুরভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাসের সাথে অবিচার করেছে ও অন্যায় করেছে। স্বয়ং মুসলিমরা যখন একই কাজ করতে লাগল তখন কোন ইতিহাস সচেতন মানুষের পক্ষে নির্বিকারভাবে বসে থাকা সম্ভব নয়। ইতিহাসের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সাইয়্যিদ সুলাইমান নদবি রহ. এগিয়ে এলেন। মুসলিমদেরকে ভুলে যাওয়া ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিতে ও উসমানিদের প্রতি মুসলিম উম্মাহর সঠিক ও শুদ্ধ অনুভূতি অটুট রাখতে তার মতো ইতিহাসবেত্তার বড়ই প্রয়োজন ছিল।

বাগদাদে আব্বাসি খিলাফতের পতনের পর মুসলিম বিশ্ব একটি অভিভাবকশূন্য সময় পার করে। সারা পৃথিবীতে মুসলিমদের দুর্দশার নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়। ক্রুসেডারদের ক্ষুৎপিপাসা প্রবলতর হতে থাকে। পৃথিবীজুড়ে তারা মুসলিমদের হত্যা করে বেড়ায়। মুসলিম ভূখণ্ডগুলো ছোট ছোট প্রদেশ ও অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অনৈক্যের তুমুল তুফান মুসলিমদেরকে শত্রুর সম্মুখে তুচ্ছ খড়কুটোয় পরিণত করে। এহেন অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যূনতম কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি মুসলিমরা।

ইতিহাসের এই করুণ মুহূর্তে ইসলাম ও মুসলিম জাহানের মুক্তির জন্য এবং নতুন করে বিশ্বশাসনের জন্য এক অনন্য অভিভাবকের আবির্ভাব ঘটে। যার নাম উসমানি খেলাফত। মুসলিমদের ইতিহাসে যুক্ত হয় আরেকটি সোনালি অধ্যায়। মহা কুচক্রী ক্রুসেডারদের অন্তরে সঞ্চার হয় ত্রাস।

প্রায়শই উসমানি খেলাফতের সাথে হিন্দুস্তানের সুসম্পর্কের উদাহরণ হিসেবে হিজাজ রেলওয়ে নিমার্ণে হিন্দুস্তানিদের বিরাট অংকের টাকা চাঁদা দেওয়ার কথা বলা হয় এবং আরো কয়েকটা কারণ বলা হয়। আসলে এসব খুবই গৌণ ও দুর্বল কারণ। উসমানিরা হিন্দুস্তানের প্রতি নয় শুধু; বরং সারা মুসলিম বিশ্বকে নিঃশর্তে ভালোবেসেছেন। তাদের সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে ভেবেছেন। হিন্দুস্তানের উপকূলীয় অঞ্চল– যেমন গুজরাট ইত্যাদি অঞ্চলে আজকের পর্তুগালের পূর্বপুরুষ 'পর্তুগিজ লুটেরাগণ' মুসলিমদের উপর যখন নির্মম গণহত্যা চালায় তখন তাদেরকে বাঁচানোর জন্য সুদূর কনস্টান্টিনোপল থেকে উসমানিরাই এগিয়ে আসে। অথচ 'আকবর দ্য গ্রেট' তখন দিল্লির মসনদে বহাল তবিয়তে ছিলেন।

এঘটনা ঘটেছে উসমানিরা ১৯ ও ২০ শতকে হিন্দুস্তান থেকে সহযোগিতা পাওয়ার বহু পূর্বে। তারা হিন্দুস্তানি মুসলিমদের ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিপুল সহায়তা করেছেন। বলা ভালো হিন্দুস্তানিরা উসমানিদের যে সামান্য সহযোগিতা ১৯ ও ২০ শতকে করেছিল তা ছিল উসমানি খেলাফতের পুরাতন ঋণ শোধবার অক্ষম প্রয়াস। প্রকৃতঅর্থে ইতিহাসের সঠিক পাঠ অনেক সময় মুসলিম দেশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ককে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

বড় বড় ফকিহগণ উসমানিদের নিয়ে খুব উচ্চাশা পোষণ করতেন। বড় বড় অমুসলিম রাষ্ট্রনায়ক ও শিআরাও উসমানিদের সমীহ ও সম্মান করতো। শিআরাও উসমানিদের শাসনকে 'খেলাফত' মনে করতো। এসবই এই বইতে প্রামাণিকভাবে হাজির হয়েছে।

আরব থেকে অনারব পৃথিবীর যে প্রান্তেই কোনো মুসলিম অঞ্চল ক্রুসেডারদের ও খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদীদের নির্যাতনের শিকার হয়েছে সেখানেই তারা ছুঁটে গেছেন। নিজেদের রক্ত দিয়ে সেই অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছেন। লেখকের জাদুকরী বর্ণনায় এসব ইতিহাস যেনো জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তবে এমনটা আমাদের দাবি করা মোটেই উচিত হবে না যে, উসমানিরা সব দিক থেকেই সফল ও সার্থক ছিলেন। কারণ, উসমানিদের ইতিহাস মানুষের ইতিহাস। আর মানুষের ইতিহাসে সর্বাঙ্গীন সফলতা ও সার্থকতা দুষ্প্রাপ্য একটি বিষয়। তাছাড়া মনে রাখা দরকার, আমরা সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী টিকে থাকা একটি খেলাফতের কথা বলছি। এই দীর্ঘ সময়কালে বহু যোগ্য ও অযোগ্য শাসকের হাতে শাসনভার ন্যস্ত হয়েছে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, উসমানিদের সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইউরোপিয়ানদের ক্রমোন্নয়নের মোকাবিলায় সমগ্র মুসলিম জাহানের ক্রমাবনতির দায়ভার এককভাবে উসমানিদের উপর চাপানোর পক্ষপাতী আমরা নই। তবে আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই, উসমানিরা তাদের দীর্ঘ শাসনসময়ে পররাষ্ট্র বিষয়ে খেলাফতের দায়িত্ব অনুধাবন করে ইউরোপের সঠিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারলেও খেলাফতের অভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও শিক্ষা পরিবেশের উন্নয়নে ইউরোপের সঠিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি। মনে রাখা কর্তব্য, সমরবিদ্যায় ও সমরপ্রযুক্তিতে উসমানিদের কিংবদন্তিতুল্য সক্ষমতা মূলত পররাষ্ট্রবিষয়ক আগ্রহজাত ছিল।

এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে খুব সামান্য। তবে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে আবুল হাসান আলি নদবি রহ. এর 'মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হল' বিখ্যাত গ্রন্থটি থেকে কিছু কথা এখানে উল্লেখ করবো। আবুল হাসান আলি নদবি রহ. উসমানিদের সম্পর্কে এই কঠিন সত্য ও তিক্ত বাস্তবতাটি মেনে নিয়ে বিখ্যাত তুর্কি নারী গবেষক খালেদা এদিব খানমের বরাতে বলেন–

> জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে যতদিন কালামশাস্ত্রীয় দর্শনের কর্তৃত্ব ছিলো ততদিন ওলামা ও জ্ঞানী সমাজ তুরস্কে তাদের দায়িত্ব ও র্কতব্য সুচারুরূপে পালন করেছেন। সুলাইমানিয়া মাদরাসা ও মাদরাসাতুল ফাতিহ ছিল সমকালীন যাবতীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রের কেন্দ্র। কিন্তু পাশ্চাত্য যখন ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের বৃত্ত ভেঙ্গে বের হয়ে এলো এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও নতুন দর্শনের ভিত্তি নির্মাণ করলো, যার ফলে বিশ্বে নতুন বিপ্লব সৃষ্টি হলো তখন মুসলিম ওলামা ও জ্ঞানীসমাজ আধুনিক শিক্ষার দায়িত্ব ও আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্যপালনে

সম্পূর্ণ ব্যার্থ হলেন। তারা ভাবতেন, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি এখনো সেখানেই নিশ্চল আছে যেখানে ছিলো খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। এই মারাত্মক ভ্রান্তিকর চিন্তা খৃস্টীয় উনিশ শতক পর্যন্ত তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করেছিলো।[১]

দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান মুসলিম সমাজের ব্যাপক অংশের চিন্তা ও কর্মেও এমন মনোভাব বিদ্যমান। সময় পরির্বতন হলেও অবস্থা অপরিবর্তিত।

পরিশেষে বইটির রচয়িতা সুলাইমান নদবি রহ. সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ভারতীয় উপমহাদেশে বিগত দুই শতকে যে অল্প কয়জন মনীষা সীরাত, ইতিহাসবিদ্যা ও জ্ঞানগবেষণায় অনন্য উচ্চতা স্পর্শ করেছেন এবং সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তাদের একজন তিনি। তিনি নিকট অতীতের মুসলিম বিশ্বের এমন একজন বরেণ্য ও বিদগ্ধ গবেষক, দার্শনিক, জীবনীকার, সাহিত্যিক, সমালোচক এবং শিক্ষাবিদ, যার মতামত, পাণ্ডিত্য ও গবেষণাকর্মকে বিদ্বান মহলে সনদ হিসেবে গণ্য করা হয়। আল্লামা ইকবাল রহ. তাকে 'উস্তাদুল কুল' এবং ইসলামী জ্ঞান-গবেষণার 'দুধের নহরের ফরহাদ' প্রবাদে আখ্যা দিয়েছেন।

এমন একটি বই বাংলা ভাষায় অনন্য সংযোজন নিঃসন্দেহে। পাঠকদের প্রতি উপযুক্ত মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার নিবেদন রইল। প্রকাশক, পাঠক সংশ্লিষ্টজনদের কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা রইল।

কামরুল হাসান নকীব
০১.১২.২০২০ ইং
হাছানিয়া কমপ্লেক্স, রূপনগর, পূর্ববাড্ডা

---

[১]২৭৪ পৃষ্ঠা, মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হল, অনুবাদ, মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ ।

বিষয় বিন্যাস

প্রারম্ভিকা

খেলাফত ও ইসলামি বিশ্বের পারস্পরিক সর্ম্পকের মৌলিক কাঠামো ও আকৃতি-প্রকৃতি কী ছিল, খেলাফত বিষয়ক আমার ঐতিহাসিক রচনাবলির পাঠকগণ এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অবগত আছেন। বিশ্বাসগতভাবে ও মানসিকভাবে সবসময় এবং কার্যতভাবে অধিকাংশ সময় এমনটা ভাবা হয় যে, সমগ্র ইসলামি বিশ্বের ইমাম, হাকিম এবং প্রধান একজন ইমামে আকবার অথবা খলিফা ছিলেন। যেসব মুসলিম দেশ সরাসরি খেলাফতের অধীনে ছিলো না তারাও নিজেদেরকে খলিফার ধর্মীয় ক্ষমতাবলয়ের বাইরে মনে করতো না। সেসব দেশের বাদশাহগণকে ততকালীন ইমাম বা খলিফার প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত মনে করা হতো। এভাবে এক বিশাল সম্মিলিত ইসলামি প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল। যা ইসলামের সকল ধর্মীয় স্থান যেমন, বাইতুল মুকাদ্দাস ও হারামাইনসহ অন্যান্য স্থানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতো। দুনিয়ার বুকে ইসলামের মান-মর্যাদার জিম্মাদার ও রক্ষক এবং অমুসলিম দেশসমূহে বসবাসরত মুসলিমদের শেষ আশ্রয়স্থল ও নিরাপদ ঠিকানা মনে করা হতো।

খেলাফতে আব্বাসিয়া যতোদিন শক্তিশালী ছিলো ততোদিন যথাসম্ভব এই দায়িত্বপালনে কোন ত্রুটি হয় নি। তবে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, ইসলামি খেলাফতের ইতিহাসে এমন সময়ও এসেছে যখন খেলাফতের কেন্দ্র ও দায়িত্ব দুর্বল হাতে ন্যস্ত ছিল। কখনো কখনো মুসলিম সুলতানদের ইতিহাসে এমন সময়ও এসেছে যখন দক্ষতা, আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানের সাথে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করা হয়নি।

বাগাদাদে আব্বাসি খেলাফতের ন্যূনতম একটি রাজনীতিক শক্তি ছিল। তবে মিসরে আসার পর আব্বাসি খেলাফতের ক্ষমতা অনেকটা ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক খোলসে টিকে ছিলো। তাই আব্বাসি খেলাফতের প্রতিনিধি ও এক্সিকিউটিভ মিসরের মামলুক বাদশাহগণ যখন শক্তিশালী ছিল তখন তাদের কৃতিত্বকে মিসরের বাইরের মানুষগণ খেলাফতের কৃতিত্ব হিসেবেই গণ্য করতো। হিন্দুস্তান, ইরান, রোম, তুর্কিস্তান, প্রভৃতি দেশে খেলাফতে আব্বাসির গুণকীর্তন ও সম্মান সমীহ হাসিলের রহস্য মূলত এটাই। সেসব দেশে খুতবায় আব্বাসি খলিফাদের নাম নেওয়া হতো। এভাবেই ইসলামের মহান প্রজাতন্ত্রের এক অবকাঠামো কায়েম ছিল।

উসমানি খেলাফতের পূর্বে ইসলামি বিশ্বের অবস্থা

নবম শতকের শেষের দিকে ইসলামি বিশ্বের নকশার দিকে নজর দিলে দেখা যাবে, এক বিশাল প্রজাতন্ত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিথর হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যার মন ও মস্তিষ্কের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব এতোটাই প্রবল ছিল যে, তার দেহের নিকটবর্তী অঙ্গগুলোই নিস্তেজ ও নিস্তরঙ্গ ছিল; দূরবর্তী অঙ্গের কথা না হয় বাদই দিলাম। বড় বড় সালতানাত ও হুকুমত ছোট ছোট রিয়াসাত বা প্রদেশ ও উপদেশে বিভক্ত ছিলো। হিন্দুস্তান থেকে স্পেন পর্যন্ত একই দৃশ্য ও একই অবস্থা দৃষ্টিগোচর হতো। সিন্ধ, গুজরাট, মালওয়া, বিজয়পুর, আহমদনগর, বুরহানপুর, বিদার, কাশ্মীর, জৌনপুর, বঙ্গ, দিল্লি ইত্যাদি ছোট ছোট অঞ্চলে হিন্দুস্তানের শক্তি বিভক্ত ছিল। তুরকিস্তানের বুখারা, বলখ, খাওয়ারিজম, মারওয়ার, কাশগরে খানরা ছোট ছোট উপদেশে প্রশাসক ছিল। রুশ অঞ্চলে ক্রিমিয়া, কাজান ও আস্ত্রাখান নামক দুটি অঞ্চলে ভাগ হয়ে যায়। ককেশাশে আজারবাইজান, দাগিস্তান, কিরগিস্তান প্রতিটি অঞ্চলই ছিল বিক্ষিপ্ত ভূখণ্ড। আফগানিস্তান ও খুরাসানে একাধিক তাইমুরি শাহজাদা, তুরকেমেন আমিররা বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করছিল। ইরাক একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল । মিসর ও শামে মামলুক সুলতানদের সালতানাত ছিলো। আরব ভূখণ্ড ছিলো বিভিন্ন ছোট ছোট গোত্রপতির অধীনে। এমনকি ইয়ামানে একেক শহরের একেক আমির ছিল। হিজাজ অভিজাত এক খান্দানের অধীন পরিচালিত ছিল। যারা কখনো মিসরের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতো। আবার সুযোগ পেলে কখনো কখনো ইয়ামেনের শাসকের সাথে হাত মেলাতো । ইয়ামেনের শাসক ও মিসরের সুলতানের মধ্যেধারাবাহিক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ বিদ্যমান ছিল। থেকে মিসর ছিল সুদান,ত্রিপোলি, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ফাস এর মতো বহু উপদেশে বিভক্ত। আর স্পেন ছিল গ্রানাডা, করডোবা, টোলেডো, জাতিভা, হিমস, বাদাজজ এর মতো বহু খণ্ডে বিভক্ত। যার মধ্য থেকে কেবল দুয়েকটি এখন বাকি রয়েছে। ইসলামি রাজপরিবারের সবগুলো এক এক করে উজাড় হতে লাগলো। খেলাফতের দেহাবরণ শতচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ইসলামি আন্দালুসের রাজদরবারের শেষ মন্ত্রী লিসানুদ্দীন খতিব নবম শতকের শেষ দিনগুলোর অবস্থা সম্পর্কে কবিতার ভাষায় বলেন,

খেলাফতের মাল্য ছিঁড়ে গেছে। মূল ও মূলের ছায়া সবই হারিয়ে গেছে।

ক্ষুদ্র ভূখণ্ডসমূহের প্রত্যেক শাসক হল বাদশাহ। গাছের প্রতিটি শাখায় তারস্বরে বাক দিচ্ছে একেকটি মোরগ।

জালিম ও মাজলুমের সংখ্যা বেড়ে গেলো। ভাগিদারগণ জমিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ভাগ করে নিলো।

ফিতনার জন্য বহু গরদান মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। মানুষের উপাধি নিয়ে প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী বেড়ে গেলো।

দীন ইসলামের উপর ইত্যবসরে ডাকাতের আক্রমণ হলো। ইউরোপের খৃস্টানরা মানুষের জান ও মালের উপর অধিকার জমাল।

কারণ তারা মুসলমানদের একতার বিনষ্টির স্বপ্ন দেখেছে। জাতির প্রাণ তাই তো এখন ওষ্ঠাগত।[২]

ব্যর্থ ক্রুসেডারদের নতুন চাতুরী

ইতিহাসের এসময় ইউরোপিয়ান যুদ্ধবাজ ক্রসেডাররা মিসরের মামলুক ও আইউবি সুলতানদের তরবারির কাছে পরাজিত হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের কৌশল ও পদক্ষেপ পাল্টাতে শুরু করল। তাদের প্রথম পদক্ষেপ ছিল, ইউরোপের সকল খৃস্টানশক্তি এক হয়ে মুসলমানদের হাত থেকে 'পবিত্রভূমি' উদ্ধার করবে। তবে দু'শ বছরের ধারাবাহিক শক্তিপরীক্ষার দ্বারা তাদের জানা হয়ে গিয়েছিলো, এভাবে এতো সহজে সফলতা হাসিল করা অসম্ভব। সফলতা হাসিল করার প্রকৃত পন্থা হল, ইসলামকে তিলে তিলে দুর্বল করে দেওয়া। আর পবিত্রভূমি মানে কেবল ফিলিস্তিন নয় ; বরং পৃথিবীর যেখানে চাঁদের পতাকা উত্তোলিত হচ্ছে তার সবটাই পবিত্রভূমির অংশ এবং সবটাই ক্রুশের ভূমি।

---

[2] ৪৫ পৃষ্ঠা, রাকমুল হুলাল ফি নাজমিদ দুওয়াল, লিসানুদ্দীন খতিব। খতিব এগ্রন্থে আন্দালুস ও সুদূর পশ্চিমের প্রচুর তথ্য সংকলিত করেছেন। এই বইটি পাঠ্যক্রমভুক্ত হওয়ার যোগ্য।

এই পদক্ষেপকে বাস্তবায়ন করতে হলে তাদের দু'শ বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। দু'শ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে তারা বুঝেছে, তাদের মনোবাসনাকে চরিতার্থ করতে ধর্মীয় রংয়ের বদলে সাধারণ রাজনীতি, ব্যবসা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ঠুনকো অজুহাত এবং প্রাচ্যের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীদের হেফাজত ও নিরাপত্তার সাধারণ মানবিক দায়িত্বকে হাইলাইট করা হবে । আর নিজেদের সেনাবাহিনি দ্বারা মুসলিমদের উপর হামলা করার বদলে সঠিক পদ্ধতি হলো, মুসলিমদের ভেতর থেকেই নিজেদের সিপাহি ও অনুসারী তৈরি করা। যেনো অধিক দূরদর্শিতা ও চাতুর্যের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে দুর্বল, অসহায় ও অক্ষম করা যায়।

এই পরিকল্পনার বিষয়গুলো পূর্বের মতো হৈচৈ করে কিংবা ঘোষণা ও ইশতেহার জারি করে প্রচার করা হয়নি। বরং নিঃশব্দে ও সংগোপনে এবং ক্রমান্বয়ে ও সুস্থীরভাবে ইউরোপের ক্রুসেডার যুদ্ধবাজরা সামনে অগ্রসর হয়েছে। তাছাড়া যেহেতু মুসলিম বিশ্ব সেসময়ে নিজেদের মধ্যকার দীর্ঘ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দরুন বিপর্যস্ত বিপন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তাদের একতার বন্ধন শতচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো তাই ক্রুসেডারদের জন্য এটাই ছিলো সবচেয়ে ভালো সুযোগ।

এই 'পবিত্র কাজে'র সূচনা তারা আন্দালুসের ভূমি থেকে করে। কারণ আন্দালুস ছিল খৃস্টানবিশ্বের এই প্রতারণার্পূণ ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ যুদ্ধের সবচে নিকটবর্তী লক্ষ্য, নিকটবর্তী ভূখণ্ড । খৃস্টানবিশ্বের ধর্মীয় নেতা তথা পোপের আজ্ঞাধীন ও অধীনস্থ স্পেনের এক কোহেস্তানি খৃস্টান এলাকা— মুসলমানদের দয়া ও মহানুভবতার দরুন যাদের প্রাণরক্ষা পেয়েছিলো—মুসলিমদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো। স্পেনের ইসলামি অঞ্চলগুলোর পারস্পরিক বিবাদ চলাকালে এই খৃস্টান অঞ্চলটি কখনো এই পক্ষকে সহযোগিতা করতো আবার কখনো ঐ পক্ষকে সহযোগিতা করতো। যার ফলে নবম শতকের শেষ দিকে স্পেনের সকল মুসলিম অঞ্চলের সমাধি রচিত হল।

এই ভূখণ্ডের ইসলামি শৌর্য-বীর্যের শেষ নিদর্শন ছিলো গ্রানাডা। স্পেনের এই মুসলিম অঞ্চলটির বিপক্ষে সকল খৃস্টান জগত যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। গ্রানাডার মুসলিমরা এক মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক কাসিদা লিখে আফ্রিকা ও মারাকেশের মুসলিমদের কাছে প্রেরণ করে সাহায্য কামনা করলো।

মিসরের আব্বাসি খলিফার নামে প্রেরিত চিঠি পাঠ করা হলো; কিন্তু কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হলো না।

স্পেন ও পর্তুগালের জন্য এই অপ্রত্যাশিত সফলতা তাদেরকে আরো উৎসাহিত ও প্রলুব্ধ করলো। আধুনিক ইউরোপের উন্নয়নের ইতিহাসে এই সম্প্রদায় দুটিই অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতা ও পথিকৃৎ হিসেবে আবির্ভূত হয়। তারা স্থলভাগ পদানত করে জলভাগে নিজেদের জাহাজ চালনা শুরু করে। স্পেন 'পবিত্রভূমি'র তালাশে আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছে। পর্তুগাল আফ্রিকা হয়ে প্রাচ্যের পথ ধরে।

আধুনিক ও মধ্য যুগের সন্ধিক্ষণে মুসলিমদের দুর্দশা

ইতিহাসের এই পর্যায়ে এসে পাঠকরা আমার সাথে একটু সময় মুসলমানদের তদানীন্তন অবস্থার প্রতি মনোযোগী হন। আমরা এখন দেখাবো সেসময়ে মুসলিমরা কেমনতরো জটিলতার ভেতর দিয়ে দিনাতিপাত করছিলো। ইউরোপের খৃস্টান সেনারা একযোগে চারদিক থেকে হামলা করে বসে। ৮৯৩ হিজরি থেকে রুশরা মধ্য এশিয়ার মরুভূমি থেকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ শুরু করে। এটা কাজানের ইসলামি অঞ্চল ছিলো। দীর্ঘ ধারাবাহিক যুদ্ধের পর ৯৯৩ সালে এই ইসলামি অঞ্চলের পতন ঘটে। তারপর আসে আস্ত্রাখান ও ক্রিমিয়ার পালা। এক পর্যায়ে তার সীমা কৃষ্ণ সাগর ও ইরানের সীমান্ত পর্যন্ত চলে আসলো।

৮৯৭ হিজরি সালে স্পেন ও পর্তুগাল আন্দালুসে ইসলামকে পরাজিত করে সামনে এগিয়ে যায়। স্পেন বন্ধুতার ছলে তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়া দখল করে ফেলে । পর্তুগাল সমগ্র আফ্রিকায় তাণ্ডব চালিয়ে আরব সাগর ও ভারত সাগরে এসে যাত্রাবিরতি করলো এবং আরব ও ভারতের মুসলিম উপকূলীয় অঞ্চলে হত্যা ও লুণ্ঠনবৃত্তি শুরু করল। অন্যদিকে মারাকেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ওয়াতাসি গোত্রের উপর হামলা চালায়। যে গোত্রটি মরক্কোতে নতুন করে ইসলামি হুকুমাতের ভিত্তিস্থাপনে সচেষ্ট ছিল। কিছু সময় যেতে না যেতেই তারা সাফি, আজমুর, মামুরা বিজয় করে নেয়।

ক্রুসেডারদের চতুর্থ গোপন আস্তানা ছিল রোম সাগরের দ্বীপসমূহ। সাইপ্রাস, মাল্টা, রোডিস ইত্যাদি অঞ্চলের ক্রুসেডার সেনাদল মিসর ও শামের নজরদারিতে ব্যস্ত ছিল। বিশেষত সাইপ্রাস, মাল্টা, রোডিসে তো 'সেন্ট জন ক্রুসেডার যোদ্ধাদে'র বড় বড় মজবুত দুর্গ ছিল। যারা দিনরাত

কেবল মুসলমানদের রক্তপিপাসায় মগ্ন থাকতো। আর এটাই ছিল তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব। এরা মূলত ফিলিস্তিনের ৯০ বছর বয়সী খৃস্টান রাষ্ট্রের পরাজিত সৈনিকদের বংশধর ছিল। এরা রোম সাগরের নজরদারি করতো। তাদের চোখের সামনে দিয়ে কোনো মুসলিম জাহাজ অন্য কোনো মুসলিম দেশে যেতে পারতো না। কিপচাক (কোমানিয়া) ক্রিমিয়া ও রোমের মুসলমানরা হজ্জ করতে পারতো না। ভেনিস শহরের বাজার মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম ও মুসলিম পুরুষদের স্বাধীনতার ক্রয়-বিক্রয়ের বড় বাজারে পরিণত হয়েছিল। যে বন্দি কোনো অবস্থাতেই ইসলাম ত্যাগ করতে রাজি হতো না, সে যদি পুরুষ হতো তাকে মিসরে নিয়ে বেচে দেওয়া হতো। সেখান থেকে তাকে মামলুক সেনবাহিনীতে ভর্তি করা হতো। আর নারী হলে তাকে ইতালির আমির ও বিত্তবানদের বালাখানা ও প্রমোদশালায় বেচে দেওয়া হতো। আর সুযোগ পেলে এস্কান্দারিয়া পর্যন্ত নিয়ে আসা হতো।

সাফাভি সাম্রাজ্যে সুন্নিদের করুণ পরিণতি

এরচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, ঐ সময়ে ৯০৫ সালে ইরান এবং খোরাসানে সাফাভি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়; যারা সংকীর্ণ মানসিকতার দরুন ইসলামের বদলে শিআ মতবাদকে নিজেদের রাজনীতিক মতাদর্শের কেন্দ্রীয় আদর্শ নির্বাচন করে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীগণ হয়তো সেদেশ থেকে দেশান্তরে যেতে বাধ্য হয়েছে কিংবা নিহত হয়েছে ; নয়তো তাদেরকে জোর করে শিআ বানানো হয়েছে। সাফাভিরা উপরন্তু উসমানি সালাতানাতের বিদ্রোহী শাহজাদাদের নিজেদের দেশে আশ্রয় দেয় এবং মিসরের সুলতানকে চিঠির মাধ্যমে উসমানি সালতানাতের বিরুদ্ধে এক সমবেত হামলার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে মুসলিমদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দেয় এবং সামগ্রিকভাবে দেখা দেয় ইসলামের বিপর্যয়।

উসমানি খেলাফত

যেভাবে সমগ্র ইসলামি বিশ্ব উসমানি খেলাফতের পতাকাতলে সমবেত হলো

মোটকথা, ৯১৮ সালে সুলতান সালিম যখন উসমানি সিংহাসনে পা রাখলেন তখন সমগ্র ইসলামি বিশ্বে এমন বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য বিরাজমান ছিল যে, সুলতান ডানেবামে, আগেপিছে যেদিকেই তাকিয়েছেন নজরে এসেছে কেবল ইসলামের রাজনীতিক শক্তির শতধা বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি। তিনি বুঝতে পারলেন, যতোক্ষণ ইসলামের প্রাণভূমি শাম ইরাক মিসর ও আরব একটি কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে একতাবদ্ধ না হবে এবং ইসলামি বিশ্ব খেলাফত কায়েমের মতো একটি নির্বিবাদ ও সর্বজনমান্য বিষয়ে দৃঢ়চেতা ও উদ্যমী না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের বিক্ষিপ্ত ভূখণ্ডগুলো উদ্ধার করা যাবে না এবং তাদের ভেতর শত্রুর হামলা থেকে আত্মরক্ষার শক্তিও আসবে না। এই বিশ্বাস দ্বারা চালিত হয়েই সুলতান সালিম সমগ্র ইসলামি বিশ্বকে একটি ইসলামি পতাকাতলে (যার চেয়ে মজবুত শক্তিশালী বিস্তৃত ইসলামি ব্যানার পৃথিবীতে আর একটিও ছিল না) সমবেত করতে বাধ্য হলেন। খেলাফত ও সালতানাতের ব্যক্তিত্বের মধ্যেবিভাজন খেলাফতের ক্ষমতা দাপট ও পরাক্রমশালিতার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। তাই একজন রাজনীতিক ব্যক্তির মধ্যেসালতানাত ও খেলাফতের দ্বিবিধ গুণাবলির সমাবেশ হওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আর এজন্য স্বয়ং সুলতান ছাড়া উপযুক্ত কোনো ব্যক্তির কথা কল্পনাও করা যায় না।

সুলতান সালিম তার পরিকল্পনার ছক অনুযায়ী কাজ করার দৃঢ় সংকল্প করেন। অবশেষে ৯৬৩ হিজরি সনে তার এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়; যখন ইরাক মিসর শাম কোনো বড় লড়াই ব্যতীতই তার পতাকাতলে সমবেত হয়। সকল আরব জাতি বিনা রক্তপাতে তার পতকাতলে সমবেত হয়। আর সবখানে মসজিদে মসজিদে সুলতানের নামে খুতবা পড়া শুরু হয়।

খৃস্টান বিশ্ব ইসলামের নির্জীব অবকাঠামোর মধ্যেজীবনের সামগ্রিক প্রাণস্পন্দনের শক্তি অনুভব করলো। ইসলামের মানসিক শক্তির মধ্যে এমন

শক্তির সঞ্চার হলো যার মাধ্যমে যুগের শরীরে অভিনব পরিবর্তন সূচিত হতে লাগলো।

ইংরেজি ভাষায় বর্তমান সময়ে "Historians History of The World" এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য আর নেই। এই গ্রন্থের লেখকগণ বলেন–

> সালিম এখন প্রকৃত অর্থেই পবিত্র স্থানসমূহের রক্ষক হয়ে গেছে। সে কায়রোতে এক অসহায় নির্বোধ শাসকের দেখা পায়; যাকে মুস্তানসির বিল্লাহ নামে ডাকা হতো। যার একমাত্র বৈশিষ্ট্য বা কৃতিত্ব হলো সে আব্বাসি খেলাফতের দ্বিতীয় শাখার আঠারোতম খলিফা । সালিম তার বিষয়ে পদক্ষেপ নিলো। যতক্ষণ পর্যন্ত সে খেলাফতের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেয়নি ততোক্ষণ তাকে স্বাধীনতা দেয়নি। এর বদলায় সালিম তাকে কিছু নগদ অর্থ প্রদান ও মাসিক ভাতা চালু করেন। ঠিক তখনই সুলতান সালিম তার নামের সাথে 'খলিফা' উপাধি যুক্ত করেন। খলিফা এখন আর কোনো অসহায় বার্ধক্যপীড়িত ব্যক্তি রইলেন না । তিনি এখন অনেক বিশাল ক্ষমতাধর এক সেনাবাহিনীর মালিক হয়ে গেলেন; এক সময় যা ইসলামের গৌরব ছিল। ঐ দিন থেকে ইসলামের কেবল একজন নেতা ছিল। রাজনীতিক ও ধার্মিক সকল বিষয়ের ক্ষমতা ছিল তার হাতে।[৩]

হারামাইন শরিফাইনের সেবায় উসমানিদের অভিষেকের ইতিহাস

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন যুগান্তকারী বিপ্লব কীভাবে সংঘটিত হল? অর্থাৎ খেলাফাতের এই গুরুদায়িত্ব উসমানি বংশধরদের কাছে কীভাবে আসলো? এবং সুলতান সালিম কীভাবে হারামাইন শরিফের সেবা করার সৌভাগ্য ও সুযোগ পেলো? আমি এবিষয়ে নিজের কলমে কিছুই লিখতে চাই না। মক্কার বিদ্বানগণ ও হারামাইনের আলেমগণ নিজেদের রচনায় যা লিপিবদ্ধ করেছেন আমি তা কেবল অনুবাদ করে পাঠকের সামনে হাজির করবো। শাফি

---

[৩] Historians History of The World, V. 24p.145

মাজহাবের মুফতি শাইখ ওয়াহলান মাক্কি তার "তারিখুল ফুতুহাতুল ইসলামিয়্যাহ" গ্রন্থে লেখেন–

> ৯২২ হিজরি সনে সুলতান সালিম মিসর ও শামের শাসক সুলতান ঘুরির বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ নিলেন। ইরানের বাদশাহর সাথে সুলতান ঘুরির আঁতাত ছিল এবং সে ইরানিদের সাথে যুদ্ধের সময় উসমানি সেনাবাহিনীর কাছে রসদ পাঠাতে অসম্মতি জানিয়েছিলো।
>
> ... তাদের মধ্যে ছোটখাটো একটি যুদ্ধ হয়। সুলতান সালিমের বিজয় হয় এবং ঘুরি ময়দানেই মারা যান। সুলতান আলেপ্পো শহরে প্রবেশ করলে তাকে আলেপ্পো শহরে সাধারণ নাগরিক ও আলেমরা তাকে কুরআন মাথায় স্বাগত জানায় এবং বিজয়ের জন্য অভ্যর্থনা প্রদান করে। সবাই তার কাছে মহানুভবতা ও দয়াশীলতা প্রদর্শনের অনুরোধ করে। সুলতান সে মুতাবেক মহানুভবতা প্রদর্শন করলেন এবং শহরে পা রাখলেন।
>
> জামে মসজিদে তার নামে খুতবা পাঠ হলো। খতিব সাহেব পূর্বেকার মিসরের সুলতানদের নাম বলার সময় "খাদিমুল হারামাইনিশ শারিফাইন" উপাধি উল্লেখ করতেন। জামে মসজিদের খতিব সাহেব যখন খুতবায় সুলতান সালিমকেও "খাদিমুল হারামাইনিশ শরিফাইন" বললেন তখন সালিম যারপরনাই পুলুকিত হলেন এবং তার বিশ্বাস জন্মালো যে, তার শেষ বিজয় হাসিল হবে। হারামাইনের সেবার সৌভাগ্য তার হাসিল হবে। এই খুশিতে সুলতান তার বিশেষ পোশাকটি খতিব সাহেবকে দান করলেন। যার মূল্য ছিল পঞ্চাশ হাজার গির্শ। তারপর সুলতান শামের দিকে রওনা হলেন। সেখানকার বাসিন্দারাও তাকে জাঁকজমকপূর্ণভাবে স্বাগত জানালো। সুলতানও তাদের সাথে নম্র আচরণ করলেন। সেখানে সুলতান তিন মাস অবস্থান করেন। ইত্যবসরে সেখানকার জামে মসজিদে সুলতান গমন করেন এবং তার নামে খুতবা পড়া হয়। সেখান থেকে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস হয়ে মিসর গমণের ইচ্ছা করলেন। ১৩

> মুহাররম ৯২৩ হিজরি সনে মিসর পৌঁছলেন। সেখানে ঘুরির পর মামলুকরা আশরাফকে তাদের বাদশাহ বানায়।

ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থে আছে সুলতান প্রথমে আশারাফকে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। শর্ত দিলেন সে যেনো সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। সে এই শর্ত মেনে নেওয়ার সাথে সাথেই মামলুকরা তাকে হত্যা করে ফেলল। তারপর এমন নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হল যার পর আর যুদ্ধ কিংবা সন্ধি কোনোটারই সুযোগ থাকলো না। বাধ্য হয়ে সুলতান সালিম মিসর সরাসরি দখল করে নিলেন। তারপর মুফতি ওয়াহলান লেখেন–

> মিসর দখল করার পর সুলতানের ইচ্ছা জাগল, হিজাজের রাজত্বও তার আওতাধীন চলে আসুক। যেনো তিনি হারামাইনের খেদমতের সুযোগ লাভ করতে পারেন। তবে মিসরের প্রাক্তন সুলতানের গর্ভনরের কাছ থেকে হিজাজের শাসন হস্তগত করতে হলে সেনা পাঠাতে হবে। সেসময় মক্কার আমির ছিল শরিফ বারাকাত। কাজি সালাহুদ্দীন সুলতানের মন্ত্রীকে পরামর্শ দিলেন, হিজাজে সেনা প্রেরণের প্রয়োজন নেই; শরিফ বারাকাত স্বেচ্ছায় একাজে সম্মত হবে। অনায়াসে সুলতানের মনের ইচ্ছা পূরণ হয়ে যাবে। কাজি সাহেব শরিফ বারাকাত সম্পর্কে প্রশংসা করে বললেন, সে সবার আগে সুলতানের আনুগত্য করবে এবং হারামাইনবাসী ও হিজাজবাসীদের কাছ থেকে সুলতানের পক্ষে বাইআত নিয়ে নিবে। সেনার বদলে একটি শাহি ফরমান পাঠানোই যথেষ্ট হবে। মন্ত্রী সুলতানের কাছে এই প্রস্তাব পেশ করলে সুলতান প্রস্তাবটি খুব পছন্দ করেন এবং দুটি মহা মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে শাহি ফরমানসহ আমির মুসলিহ বেগকে প্রেরণ করলেন। একটি উপঢৌকন ছিল স্বয়ং শরিফ বারাকাতের জন্য ; আরেকটি ছিল তার ছেলে আবু নামির জন্য।
>
> কাজি সালাহুদ্দীন শরিফকে পৃথক চিঠি লেখে সব কিছু খুলে বললেন। পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী দুজনকে মক্কার আমির নিযুক্ত করলেন। আমির মুসলিহ বেগ যখন উপঢৌকন ও শাহি ফরমানসহ শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছুল, শরিফ বারাকাত

তার ছেলে, সভাসদ ও অভিজাত নাগরিক এবং জনসাধারণের এক বিশাল মিছিল নিয়ে স্বাগত জানাতে আসলেন। বাবা ও ছেলে উপঢৌকন পরিধান করে মক্কায় ফিরে এলো। জনগণের কাছ থেকে সুলতানের আনুগত্যের বাইআত নিলেন এবং খুতবায় সুলতানের নাম পাঠ করা হলো। জনগণের সন্তুষ্টি ও জনমতের ভিত্তিতে জনগণের আনুগত্য অর্জিত হলো। তারপর ৯২৩ হিজরি সনে শরিফ তার ছেলেকে মিসরে সুলতানের নিকট প্রেরণ করলেন। সুলতান তাকে যথাযথ সমাদর করলেন এবং নিয়মমাফিক তাকেও আমির নিযুক্ত করলেন।

হারামাইন শরিফাইনের সেবায় অনন্য নজির গড়লেন সুলতান সালিম

খলিফার পোশাক পরে সিংহাসন অলংকৃত করলেন সুলতান সালিম। পৃথিবীর ইতিহাসে এই যুগান্তকারী বিপ্লবটি সাধিত হলো সম্প্রীতি শান্তি ও জনমতের ভিত্তিতে। ইসলামের সবচে বড় ধর্মীয় জমায়েত তথা হজ্জের মওসুমে যখন পৃথিবীর বহু প্রান্তের মুসলিম জনগোষ্ঠীসমূহ একত্রিত হলো তখন তার খেলাফতের ঘোষণা দেওয়া হলো। এর পরের ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তার এই বাইআতের পরবর্তী ৩ বছরের সামান্য সময়ে হারামাইনের খেদমতে যে অনন্য নজির তিনি স্থাপন করেছেন তা অবিস্মরণীয়

আমির মুসলিহ, যে বহর ও শাহি ফরমান নিয়ে এসেছিলো সুলতানের আদেশে সে মক্কায় রয়ে গেলো এবং অনেক উত্তম ও মহৎ কাজ আঞ্জাম দেন। যার সওয়াব সুলতানের প্রাপ্য। মিসরের পূর্বেকার মামলুক সুলতানের পক্ষ থেকে শরিফ বারাকাতকে যে ভাতা দেওয়া হতো তার সাথে ৫০০ দিনার (আশরাফি) বাড়িয়ে দেওয়া হলো।

একটি দফতর খোলা হয়, যার কাজ ছিল হারামের প্রতিবেশীদের নাম লিপিবদ্ধ করা। হারামের প্রতিবেশীদের ১০০ দিনার ভাতা দেওয়া হতো। এই ভাতা পুরোটাই মিসরের রাজকোষ থেকে দেওয়া হতো। ৩০ জনের একটি

দল নিযুক্ত করা হয়; যারা প্রতিদিন এক খতম কুরআন শরিফ পড়ত। তাদের প্রত্যেকের জন্য ১২ দিনার করে ভাতা নির্ধারণ করা হলো। প্রতি বছর মক্কার অনাহারী ও ফকিরদের জন্য মিসর থেকে খাদ্যশস্য পাঠানো হতো; যাকে 'জখিরা' বলা হতো। সুলতান এই প্রথাটিও বহাল রাখেন। প্রচুর খাদ্যশস্য মক্কায় ও মদিনায় পাঠান। উলামা মাশায়েখ ও মুফতি সাহেবদের উপস্থিতিতে এবং শরিফ বারাকাতের নির্দেশনায় শস্য বণ্টন করা হয়। সবার পরামর্শক্রমে কিছু শস্য বিক্রি করে দেওয়া হলো। যার দ্বারা জিদ্দা থেকে মক্কা পর্যন্ত শস্য বহনের খরচ নির্বাহ করা হতো। সকল মহল্লার প্রতিটি ঘর এবং ব্যবসায়ী ও সেনাবাহিনী ছাড়া সকল ঘরের মহিলা পুরুষ শিশু ও গৃহকর্মীদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। এভাবে বারো হাজার লোকের একটি তালিকা তৈরি হয়। প্রত্যেককে ১৪৪ পেয়ালা খাদ্যশস্য দেওয়া হলো এবং খাদ্যশস্য বিক্রি করে যে লাভ (উদ্বৃত্ত) হয়েছিলো তা থেকে সকলকে ১ দিনার করে দেওয়া হলো।

চার মাজহাবের মুফতিদের প্রত্যেককে তিন আরুব খাদ্যশস্য দেওয়া হলো। কিছু কিছু খান্দানের মর্যাদামাফিক তাদেরকে কিছু বেশি দেওয়া হলো। মক্কার বিখ্যাত আলেম ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক শাইখ কুতবি বলেন, এ ছিল সুলতানের ভালোবাসার অনুদানের প্রথম পর্ব।

তারপরের ঘটনা মুফতি ওয়াহলান শাইখ কুতবির বরাতে উল্লেখ করেন–

সাধারণভাবে সকল মুসলিমদের উপর এবং বিশেষভাবে হারামাইনবাসীদের জন্য উসমানি খেলাফাতের দীর্ঘজীবিতার জন্য দুআ করা কর্তব্য। কেননা, এই মহান সালতানাত ইসলামের স্তম্ভস্বরূপ; এর মহানুভবতা সকলের হৃদয় দখল করে নিয়েছে। বিশেষ করে হারামাইনবাসীদের প্রতি তার অব্যাহত মহানুভবতা সকলকে বিমোহিত করেছে। এমন পূর্বেকার কোনো সালতানাতের পক্ষ থেকে মহানুভবতার কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না।

মক্কার আরেক ঐতিহাসিক ইবনে আল্লান বলেন,

> মিসর বিজয়ের পূর্বেও হারামাইনের প্রতি সুলতান সালিমের প্রচণ্ড ভালোবাসা ছিল। এবং তিনিই প্রথম হারামাইনে ভালোবাসার অনুদান (প্রীতি-অর্ঘ্য) চালু করেন।

মুফতি ওয়াহ্লান তারপর লেখেন,

> তারপর থেকে খেলাফাতে উসমানিয়ার অন্যান্য শাসকরা এই অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকেন। বর্তমান সময়ে মক্কাবাসীদের বারো হাজার আরুব এবং মদিনাবাসীদের জন্য সাত হাজার আরুব খাদ্যশস্য দান করা হয়। আল্লাহ তাআলা খেলাফাতে উসমানিয়ার সম্মান ও স্থায়িত্ব বাড়িয়ে দিক।

সুলতান কতিপয় ভবনের সংস্কার করেন। মাকামে হানাফি পুনর্নির্মাণ করেন। আমির মুসলিহ পুনরায় মদিনায় গমণ করেন। সেখানে গিয়েও তিনি তার সদাশয় কর্মের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। যার ফলে শুষ্ক ও অনুর্বর জমি এবং স্থায়ী দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে সবুজ ও সমৃদ্ধির বন্যা বয়ে গেলো। মদিনায় লোকদের সমাগম অভাবনীয় পরিমাণে বাড়তে লাগলো। সেই সময়ের ঐতিহাসিক শাইখ কুতবির সাক্ষ্য হলো, আমি ছোট বেলায় (অর্থাৎ মিসরের সুলতানদের সময়ে) অধিকাংশ সময়ই হারাম শরিফ জনশূন্য দেখতাম এবং নির্বিঘ্নে একাকী তোয়াফ করার সৌভাগ্য হতো। 'সাই'র ব্যস্ততম জায়গাটি চাশতের সময় নির্জন হয়ে পড়তো। আর প্রায়ই দেখতাম খাদ্যশস্যের কাফেলা এসে দাঁড়িয়ে আছে। তার সকল খাদ্যশস্য কেনার মতো কেউ নেই। তাই সে অগত্যা নির্দিষ্ট সময়ের প্রতিশ্রুতি মাফিক সকল খাদ্যশস্য বিক্রি করে চলে যেতো এবং পরে এসে মূল্য উসুল করতো। দাম অনেক কম ছিলো কারণ জনসংখ্যা কম ছিলো এবং মুদ্রার মূল্য অনেক চড়া ছিল। কিন্তু এখন তো অবস্থা এমন হয়েছে,

> জনসংখ্যা প্রচুর। উপার্জন বেড়ে গেছে। সম্পদ অঢেল। সৃষ্টিকুল এই পরিণত ও সমৃদ্ধ সালতানাতের অধীনে থেকে নিরাপত্তা ও প্রশান্তি অনুভব করছে এবং এর মহানুভবতা ও

সদাশয়তায় হাবুডুবু। আল্লাহ এর পরাক্রান্ত প্রাচুর্য ও কান্তিময় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী রাখুক।[৪]

আফসোস! এবিষয়ে আলোচনাকে আর প্রলম্বিত করার অবকাশ এখানে নেই। নতুবা হারামাইনে উসমানি সুলতানগণের সুকীর্তি সবিশদ আলোচনা করে দেখানো যেতো– কতোগুলো মাদরাসা তারা বানিয়েছে, সেখানকার উলামা মাশাইখ এবং অন্যান্য নাগরকিদের ভাতা ও পদ কিভাবে প্রদান করেছেন। সেখানে কোন কোন খাল খনন করেছেন। কোন কোন বড় বড় ভবন নির্মাণ করেছেন। বাইতুল্লাহ শরিফের সম্মান মর্যাদা, তত্ত্বাবধায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং কাফেলা ও হাজিদের আরাম ও সহজতা ও সুবধািার জন্য কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহী পাঠকগণ পূর্ববর্তী ইতিহাসের কিতাবগুলো পাঠ করে নিতে পারেন। অন্তত মক্কা শরিফের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ একটি কিতাব "আল ইলাম বিআলামি বাইতিল্লাাহিল হারাম" পড়ে নিতে পারেন ।

[৪] এ সকল উদ্ধৃতি মুফতি ওয়াহলান বিরচিত ফুতুহাতে ইসলামিয়া ২ খণ্ড থেকে গৃহীত হয়েছে।

খেলাফতে উসমানিয়া ও মুসলিম বিশ্ব

ইউরোপের ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি

সুলতান সালিম মুসলিম বিশ্বকে ইউরোপের মহা ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাঁচানোর জন্য এবং সকল ইসলামি ভূখণ্ডগুলো একটি কেন্দ্রীয় বিন্দুতে একত্রিত করতে যে উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিলো। তুর্কেম্যান কুর্দি মামলুকদের ছোট ছোট দেশ একটি বড় সালতানাতে যুক্ত হয়ে গেলো। একইভাবে ইরাক, শাম, মিসর, আরব–ইসলামের প্রধান ভূখণ্ডগুলো এখন একজন পরাক্রমশালী খলিফার কর্তৃত্বাধীনে চলে আসল।

ইউরোপের ক্রুসেডার যুদ্ধবাজদের বিপক্ষে কেবল স্থল বাহিনী যথেষ্ট ছিল না। বেশি প্রয়োজন ছিল সামুদ্রিক বাহিনী ও জাহাজ বহরের। সুতরাং সুলতান সালিম ও সুলাইমানের উদ্যমের বদৌলতে এই কাজটিও সম্পন্ন হয়। খেলাফতে উসমানিয়ার তত্ত্বাবধানে এক বিশাল নৌবহর তৈরি হয়। যার নৌযানসমূহ এক দিক থেকে বসফরাস প্রণালি থেকে যাত্রা শুরু করত বসরা ও সুরাতে এসে বিরতি নিত। অন্যদিকে আটলান্টিক থেকে শুরু করে উত্তর আফ্রিকার তীরে নোঙর ফেলত।

প্রকৃতঅর্থে আল্লাহর অনুগ্রহ যখন কোনো কওমের সঙ্গী হয়ে যায় তখন উপযুক্ত ব্যক্তিত্বস্বয়ং তৈরি হয়ে যায়। খাইরুদ্দীন বারবারুসা,[৫] তারগুত পাশা,[৬] সিনান পাশা,[৭] সুলাইমান পাশা,[৮] পিরি রেইস,[৯] সাইয়েদি আলি রেইস,[১০] পিয়ালি পাশা,[১১] প্রমুখ নৌ সেনাপতির জন্ম হয়েছে। হিন্দুস্তান

---

[৫] ১৪৭৫-১৫৪৬ খৃস্টাব্দ

[৬] ১৪৮৫-১৫৬৫ খৃস্টাব্দ

[৭] ১৫২০- ১৫৯৬ খৃস্টাব্দ

[৮] ১৪৬৭-১৫৪৭ খৃস্টাব্দ

[৯] জন্ম আনুমানিক ১৪৬৫ – ১৪৭০ খৃস্টাব্দে মৃত্যু ১৫৫৩ খৃস্টাব্দ

[১০] ১৪৯৮-১৫৬৩ খৃস্টাব্দ

[১১] ১৫১৫-১৫৭৮ খৃস্টাব্দ

থেকে শুরু করে তিউনিসিয়া পর্যন্ত সকল সাগর ও মহাসাগর যাদের নখদর্পণে ছিল।

পাঠকদের স্মরণ থাকার কথা, আমরা আলোচনার শুরুতে খৃস্টান হানাদারদের চতুর্মুখী হামলার কথা আলোচনা করেছিলাম।

১. রোমসাগর এবং ইতালির অবশিষ্ট ক্রুসেডার যোদ্ধারা সাইপ্রাস, রোডিস, মাল্টা, ভেনিস, জেনেভাকে নিজেদের কেন্দ্র বানিয়েছিল। বিশেষত সাইপ্রাস, রোডিস, মাল্টার সেনাদের দ্বীপসমূহ কেল্লা দ্বারা বেষ্টিত ও তোপ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং নৌবহর সর্বদা তাদের কাছাকাছি রাখত। এদেরকে 'নাইটস অব সেন্ট জন' নামে উপাধি দেওয়া হয়। এদের জীবনের দিনরাতের উদ্দেশ্যই ছিল মুসলিমদের হত্যা ও লুণ্ঠন করা এবং যাদেরকে সবসময় খৃস্টানবিশ্ব এবং বিশেষত ইউরোপের ধনভাণ্ডার থেকে বরাবরই প্রচুর উপঢৌকন প্রদান ও সহযোগিতা করা হত।
২. স্পেনিশরা আন্দালুস ধ্বংস করে উত্তর আফ্রিকার ইসলামি ভূখণ্ডগুলোকে একেক করে পদানত করছিলো এবং তাওহীদি কালিমার প্রচারকদের উপর অত্যাচারের এমন এমন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে যা বর্ণনা করতে খৃস্টান ঐতিহাসিকদের কলম এখনো কেঁপে ওঠে।
৩. পর্তুগিজরা মারাকেশের উপকূলসমূহ ধ্বংস করে প্রাচ্যে আরব ও হিন্দুস্তানের উপকূলে বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ ও লুঠতরাজ চালায়।
৪. রুশরা একেক করে তাতারি দেশগুলো দখল করে নিল। সুলতান সালিম ও তার ছেলে সুলাইমান দ্যা গ্রেট ও তার নাতি দ্বিতীয় সুলাইমান মুসলিম বিশ্বকে এই চতুর্মুখী হামলা থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় পশ্চিমাদের নৃশংসতা

এই পর্যায়ে আমরা খোদ খৃস্টান ঐতিহাসিকদের বর্ণনার উপর নজর বুলাব; আমরা দেখাব ঐ সময় খৃস্টানবিশ্ব মুসলমানদের রক্তপান করার জন্য কেনো ও কিভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছিলো। 'Historians History of The World' এর লেখকগণ ঐ সময়ের চিত্রটা এভাবে তুলে ধরেছেন–

১৫২০ থেকে ১৫৬৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল কেবল উসমানি ইতিহাসের জন্য নয় বরং পৃথিবীর ইতিহাসে উত্তম একটি সময়। পশ্চিমা বিশ্বের খৃস্টান দেশগুলো সবেমাত্র সামন্ততন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসল। তারা নিজেদের বহন-বাহন পোক্ত ও শক্তিকে মজবুত করছিলো। তারা আরো ভালোভাবে মোকাবিলার জন্য, নিজেদের সুদৃঢ় শক্তিমত্তার প্রদর্শন এবং নিজেদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের সুবিন্যস্ত কৌশল আত্মস্থ করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো । এসবই তাদের মধ্যযুগের দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতার ফসল।

সেই সময়(১৫২০) শুরু হওয়ার পর প্রায় চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। উসমানি শাসকগণ মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যসমূহের উপর হামলার ইচ্ছা করলো। দুর্বল উসমানি শাসক দ্বিতীয় বাইজিদের সময়ে খৃস্টানবিশ্বের ছোট ছোট দেশগুলোর সাথে এই ইউরোপিয়ান যুদ্ধচলমান ছিল। তার ছেলে সালিমের সকল শক্তি ইসলামি সম্প্রদায়সমূহের উপর বিজয়ের পেছনে ব্যয় হয়েছে। এই দুই সুলতানের শাসনকালে তদানীন্তন ইউরোপের সকল দেশগুলো শৈশব থেকে বের হয় যৌবনের উন্মাতাল ময়দানে পৌঁছে গিয়েছিল। স্পেন থেকে ইসলামের শেষ চিহ্নটুকুও মিটিয়ে দেওয়া হল।এবং সকল খৃস্টান রাষ্ট্রকে এক করে একটি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করা হল।

ফ্রান্সের একাদশ লুইস যেসব বিভক্ত ও অস্থিতিশীল শক্তিগুলোকে একত্রিত করেছিল তাদেরকে তিন যুদ্ধপ্রিয় বাদশাহ সপ্তম চার্লস, দ্বাদশ লুইস, প্রথম ফ্রান্সিসের তত্ত্বাবধানে সেসব শক্তিকে প্রয়োগ করে অন্য দেশ দখল করার পদ্ধতি শিখে গিয়েছিল। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ার রাজ বংশের রাজ্যশাসনেও এরূপ কেন্দ্রীয় ও সামাজিক উন্নয়ন শুরু হয়ে গেল। এছাড়াও পনের শতকের শেষের দিকে খৃস্টান বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেসব শাখা জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করেছে সেসব জ্ঞান-শাখার বিস্ময়কর ও অতুলনীয় উন্নতি সাধিত হয়।

যুদ্ধবিদ্যায়ও প্রভূত উন্নতি হয়। বড় বড় স্বশস্ত্র ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনী স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত রাখা হত। আগ্নেয়াস্ত্রের প্রযুক্তি, বিশেষত তোপের নির্মাণ ও ব্যবহারের কৌশল খুব ভালোভাবে রপ্ত করে ফেলেছিল। সেসময় এগুলোই বেশি ব্যবহার করা হত। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী অফিসারদের একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো। যেখানে করডোবার 'গ্রেট ক্যাপ্টেন' গনজালভোর শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে তালিম দেওয়া হত।

পনের শতকের শেষের দিকে এবং ষোলো শতকের শুরুর দিকে সময়টা ছিল আধুনিক ও মধ্য যুগের সন্ধিক্ষণ। এসময় ইতালি দখল করার জন্য ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ করাটাই সবচে গুরুত্ববহ বিষয় নয়। বরং এছাড়াও আরো বহু ঘটনা এই সময়টাকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। অধিকন্তু এসব ঘটনা যুদ্ধ সম্পর্কিতও নয়। বলা ভালো এসব ঘটনা খৃস্টানবিশ্বে এক নেহায়েত মজবুত ও বীরোচিত সাহসিকতা সৃষ্টি করেছিল। যা তাদেরকে ইসলামি শক্তিসমূহের বিপরীতে বহু শক্তিশালী ও অধিক ক্ষমতাধর বানিয়ে দিয়েছে।

খৃস্টানবিশ্বের অপরিমেয় শক্তিমত্তার মূলমন্ত্র ছিল প্রাচ্যের দ্বীপসমূহে ও আধুনিক বিশ্বে স্পেন ও পর্তুগালের সামুদ্রিক আবিষ্কার ও ধারাবাহিক বিজয়। পাশাপাশি প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও আধুনিক সাহিত্যের আলোকোজ্জ্বল আবির্ভাব, মুদ্রণশিল্পের বদৌলতে এনলাইটেনমেন্ট গবেষণা ও আধুনিক জ্ঞানের উন্নতি ইত্যাদি সকল বিষয় খৃস্টান বিশ্বের প্রাণশক্তিকে আরো প্রবলভাবে সমুন্নত করেছে। যার ফলে তাদের আবেগ আরো সংকল্পপূর্ণ হয় এবং কর্মক্ষেত্রের জটিল পরিস্থিতিতে আরো সহিষ্ণু ও শ্রমকষ্ট সহ্য করতে আরো প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। এছাড়াও আরো এমন উপকরণের দেখা মিলে যার দ্বারা বোঝা যায় যে ইউরোপবাসীদের এই নতুন শক্তি ইসলামি দেশগুলো বিজয়ে কাজে আসবে। কারণ সেসময়েও ধর্মীয় আবেগ ব্যাপক ও মজবুত ছিল। সামুদ্রিক পরিব্রাজকদের আবিষ্কার ও দার্শনিকদের প্রচেষ্টা, শিক্ষকদের অক্লান্ত মেধাশ্রম ও

শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম এবং সেনাদের বীরত্ব সকল কিছুই ঐ একটি লক্ষ্যকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ ক্রুসেডারদের উত্থানের জন্যই ছিল।

তাই তো উত্তাল সমুদ্রের বিপদসংকুল ও অমানুষিক শ্রমসাপেক্ষ অভিযানেও কলোম্বাসের উদ্দেশ্য ছিল এই সমুদ্রযাত্রা থেকে যা কিছু অর্জন হবে তা 'বদদীন' মুসলিমদের কাছ থেকে 'পবিত্রভূমি' মুক্ত করার কাজে ব্যবহার করা হবে। চার্লস অষ্টম যখন আলন্স ও নেপলসের মধ্যকার যুদ্ধের উত্তাল ময়দানে যুদ্ধ করেন তখন তার মনেও ছিল, সে ইতালি বিজয় করে তুর্কিদের কাছ থেকে কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে।

ইসলাম ও খৃস্টানদের শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এক মহা বিপ্লবের সূচনার নিদর্শন ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রকাশ হতে থাকে। কেননা একটি বৃহৎ খৃস্টান সাম্রাজ্য সকল শক্তিশালী বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলোকে একত্র করে একটি সাম্রাজ্য বানাচ্ছিল। পঞ্চম চার্লস কেবল শার্লেম্যানের বিস্তৃত সাম্রাজ্যই শাসন করেননি; বরং প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি ও শক্তির দিক থেকে তার শাসনামল অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। বেলজিয়াম অস্ট্রিয়ার দেশসমূহ স্পেনের নেপলস-সিসিলির সংযুক্ত রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্য এবং আমেরিকার নব আবিষ্কৃত ভূখণ্ডসমূহ সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। সে নির্বাচনের মাধ্যমে জার্মানির শাসন ক্ষমতা লাভ করে। কোরটেস ও পিজারো প্রচুর পরিমাণ সোনা ও রুপা সমেত তাকে আটলান্টিকের ওপারের পেরু ও ম্যাক্সিকো দান করে।

এমনটা ধারণা করা অমূলক নয় যে, এমন বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মালিক হওয়ার পরও তারা হয়তো উসমানিদের বিপক্ষে পেরে উঠবে না। কারণ ফ্রান্সের উচ্চাভিলাষী শত্রুতা ও জার্মানির ধর্মীয় বিরোধ তাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তদুপরি উসমানি খেলাফত খৃস্টানবিশ্বের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কারণ তার সামনেও একই

প্রতিবন্ধকতা ছিল । ইরান শত্রু ছিল; শিআ ও সুন্নির মধ্যে কঠিন দ্বন্দ্ব ছিল। আর শাম ও মিসরে ছিল বিদ্রোহের ভয়।

এই শতকের পূর্ণ সময়টাতে যদিও উসমানি খেলাফত যাবতীয় বিপদাপদ সত্ত্বেও মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিলো। আর নিজেদের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য সত্ত্বেও খৃস্টান বিশ্বের সুন্দর ও রত্নগর্ভা ভূমি তাকে আরো সুবিস্তৃত করে তুললো। কোনো প্রকার বিতর্ক ছাড়াই বলা যায়, এই সফলতার পেছনেমজবুত সামরিক শক্তি, সুউচ্চ জাতীয় প্রেরণা এবং ভূখণ্ডগুলোর ভৌগলিক অবস্থান ছিল মূল কারণ। কিন্তু উসমানি সাম্রাজ্যের সবচে বড় মাহাত্ম্য হলো, তাদের শাসনে ছিলো একজন মহান মানুষ। সে মহৎ এই জন্য নয় যে পরিস্থিতি ও পরিবেশ তার অনুকূলে ছিল। তার মহত্ত্বের কারণ এটাও নয় যে, তিনি তার যুগের স্পিরিটের সঠিক ব্যবহার করতে পেরেছেন। বরং তার মহত্ত্বের মূল কারণ হল, তিনি ছিলেন বর্তমানের একজন বিচক্ষণ সংস্কারক এবং ভবিষ্যতের একজন দূরদর্শী ব্যক্তি।

আন্দালুস ও উত্তর আফ্রিকা

আন্দালুসের ট্র্যাজিক পতন

এই দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা প্রথমেই আন্দালুসের দিকে নজর দিতে চাই। আন্দালুসের শেষ ইসলামি রাষ্ট্র ছিল গ্রানাডা। ১৪৯১ খৃস্টাব্দে এর পতন হয়। ২৫ নভেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ও একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে দিয়ে বলা হয়, যদি এই সময়ের ভেতরেশান্তি ও সন্ধি ঠিক থাকে এবং বাইরে থেকে কোনো সাহায্য না আসে তাহলে এই সময় অতিবাহিত হওয়ার পর গ্রানাডাকে খৃস্টানদের হাতে তুলে দিতে হবে। গ্রানাডার মুসলমানরা উসমানি খলিফা ও মিসরের সুলতানের কাছে সাহায্য চেয়ে দূত পাঠালো। সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে এলো না। এক মাস পর ডিসেম্বরের শেষে তারা গ্রানাডাকে খৃস্টানদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলো। আর গ্রানাডার বাদশাহ তার পরিবার-পরিজন ও সেবকসহ আন্দালুসের ভূমি ত্যাগ করে মারাকেশে আশ্রয় নেন।

খৃস্টানদের বিশ্বাসঘাতকতা ও মুসলিমদের জোরপূর্বক খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরকরণ

চুক্তিনামায় মুসলিমদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা উল্লেখ ছিল; তথাপি এই শর্ত খুব কমই মানা হয়েছে। মুসলিমদের হয়তো হত্যা করা হয়েছে; নয়তো জোরপূর্বক খৃস্টান বানানো হয়েছে কিংবা সময়ে সময়ে তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মুসলিমদের দেশান্তরকরণের ধারাবাহিকতা প্রায় এক'শ বছর পর্যন্ত চলেছে। অর্থাৎ ১৬১০ খৃস্টাব্দ মুতাবেক ১০১৭ হিজরি সালে মুসলমানদের শেষ দলটিকে তাদের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। যেখানে তারা সুদীর্ঘ নয় শত বছর যাবত বসবাস করে আসছে। এই মহা দুর্দশাময় ঘটনার তিন শত বছরেরও অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও মুসলিম বিশ্ব আজও তা ভুলতে পারেনি। এর শোক আজও তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায়। আজও তারা মূহ্যমান ।

স্পেন এতটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা সকল খৃস্টানদের সহমর্মিতা ও সহযোগিতা এবং ইউরোপের অনুগ্রহ ও দুআর মিছিলে শামিল হতে মারাকেশ, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও ত্রিপোলি পর্যন্ত মুসলিমদের পিছু ধাওয়া করেছে। স্পেন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পর্তুগাল তো সমুদ্রের বিশাল জলরাশি অতিক্রম করে এশিয়ার উপকূল পর্যন্ত মুসলমানদের ধাওয়া করেছে। রোম ও শামের উপকূল মিসর থেকে শুরু করে ইতালি পর্যন্ত খৃস্টান যোদ্ধাদের জাহাজ মুসলিমদের নজরদারি করত।

উসমানিরা কেনো আন্দালুসের মুসলিমদের সহায়তা করেনি

যেসময় মুসলিমদেরকে তাদের জন্মভূমি স্পেন থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছিলো তখন কনস্টান্টিনোপলের সিংহাসন সুলতান সালিমের বাবা দ্বিতীয় বাইজিদ সমাসীন ছিলেন। বলাবাহুল্য তিনি একজন অথর্ব ও দুর্বল সুলতান ছিলেন। তথাপি প্রথমত, জল ও স্থলপথে এমন কোনো রাস্তা ছিলো না যার মাধ্যমে আন্দালুসের মুসলিমদের তিনি সহযোগিতা পৌঁছাতে পারেন। দ্বিতীয়ত, এক মাসের এই সামান্য সময়ে তুর্কি সেনাবাহিনী সেখানে পৌঁছতেও পারবে না। হিন্দুস্তান থেকে কনস্টান্টিনোপলে দূত পৌঁছুতে তিন বছর সময় লেগেছিল। বোধহয় আন্দালুস থেকে সমগ্র আফ্রিকা ভ্রমণ করে মিসর ও শাম অতিক্রম করে রোম পৌঁছতেও এতো সময় লাগতো না। তারপর সেখান থেকে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা হয়ে মধ্যবর্তী দেশগুলো জয় করে কিংবা সাগরপথে সাইপ্রাস, রোডিস, মাল্টা, ভেনিস, জেনেভার সামুদ্রিক বেষ্টনীকে ভেঙ্গে পৌঁছার জন্য লম্বা সময়ের প্রয়োজন।

সুলতান সালিম তার পিতা দ্বিতীয় বাইজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণ

তবুও এটা অনুমান করা মোটেও কঠিন নয় যে, সুলতান সালিমের মনে তার বাবার বিরুদ্ধে যে অনুভূতি পুঞ্জীভূত হচ্ছিল এবং যে উত্তেজনা জাগ্রত হচ্ছিল তার মধ্যে ইসলামি বিশ্বের দুর্দশা ও দুর্ভোগের ক্ষোভ ও ক্রোধও কিছু অংশে কম ছিল না। একপর্যায়ে এই ক্ষোভ ও ক্রোধের বশেই বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেন। কিন্তু সফল হতে পারেননি। কিন্তু যেহেতু সৈন্যদের এক বিশাল অংশ তার সাথে ছিল তাই বাইজিদ খোদ সরে গিয়ে তাকে সিংহাসনে আসীন করান। এটা ৯১৮ সালের ঘটনা। এরপর সুলতান

নিজের ইচ্ছাগুলোকে বাস্তবায়নের সুযোগ মিলল। তিনি সর্বপ্রথম ইসলামের মূল ভূখণ্ডগুলোকে একত্রিত করলেন। যা আমরা পূর্বে সবিশদ আলোচনা করেছি। তারপর তিনি দূরবর্তী দেশগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পান।

খাইরুদ্দীন বারবারুসা

আমরা পূর্বেই জেনেছি জল ও স্থলপথে স্পেনের মোকাবিলার জন্য সৈন্য পাঠানো অসম্ভব ছিলো। অসহায় নিপীড়িত মুসলিমদের সহায়তা ও জুলুম থেকে মুক্ত করার জন্য খোদ আজারের ঘরেই ইবরাহীমকে জন্ম দিলেন।[১২] সুলতানের প্রজাদের মধ্য থেকে এক নও মুসলিম বংশ, যারা খুব সম্ভবত আলবানিয়া, রুমেলি ও গ্রীক দ্বীপে বসবাস করতো; জাহাজচালনা ও সামুদ্রিক ব্যবসা তাদের পেশা ছিল। বারবারুসা (লাল দাড়ি) নামে তিনি প্রসিদ্ধ। তারা চার ভাই– অরুজ, ইসহাক, খিজির, ইলিয়াস। খিজির পরবর্তীতে খাইরুদ্দীন নামে সমধিক পরিচিত হয়। অরুজ ও ইলিয়াস ক্রুসেডার যোদ্ধাদের দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়। ইলিয়াস মারা যায় এবং অরুজকে বন্দি করা হয়। পরে সে এক তুর্কি অফিসারের সহায়তায় মুক্তি পায়। তারা তাদের পূর্বের পেশায় ফিরে যায়, সমুদ্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে থাকে। সালিমের সময়ে আরুজ, ইসহাক, খাইরুদ্দীন খৃস্টান নৌবাহিনী থেকে লুকিয়ে উত্তর আফ্রিকার উপকূলে এসে পৌঁছে। এখানে এসে তারা দেখলো স্পেনের মুসলিমরা খুবই দুর্দশাগ্রস্ত। মারাকেশের উপকূলে আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, ত্রিপোলিতে মুসলিমদের মরণাপন্ন অবস্থা। স্পেনের শকুন চতুর্দিকে ঘুরছে।

বারবারুসা তার ভগ্নপ্রায় জাহাজের বহর মেরামত করল। সুলতানের নামের পতাকা উড়ালো। সুলতানও তাকে সাহায্য ও প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ দান করলেন। সুলতানের সহযোগিতায় সে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্পেনের সামুদ্রিক শক্তির মোকাবিলায় অবতীর্ণ হল। সত্তর হাজার দেশান্তরিত গৃহহীন স্পেনীয় মুসলিমদেরকে সে আফ্রিকায় পৌঁছায়। এই মুহাজির বা দেশান্তরীগণ পরবর্তীতে তার সেনাবাহিনীতে যোগ দান করে। স্পেনের উপকূলে তারা লাগাতার সামুদ্রিক হামলা শুরু করে। গাবেস উপসাগর একটি দ্বীপে তাদের বাসস্থান গড়ে তুলে।

---

[১২] তার বাবা ছিলেন একজন খৃস্টান ধর্মযাজক– অনুবাদক

ইত্যবসরে বিভিন্ন কৌশলে তুর্কি যোদ্ধাদের দল একের পর এক লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে থাকে। ১৫১২ খৃস্টাব্দে তারা স্পেনীয়দের থেকে বৌগি ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল; কিন্তু সফল হয়নি। ১৫১৪ সালে জেনেভাবাসীদের থেকে জিজিলি ছিনিয়ে নেয়। ১৫১৫ সালে দ্বিতীয়বার বৌগির উপর হামলা করে। কিন্তু সফল হতে পারেনি। একই বছরে আলজেরিয়া স্পেনের বিরুদ্ধে তাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করে। তারা এসে স্পেনীয়দেরকে আলজেরিয়া থেকে বের করে দেয়। এভাবে তারা দীর্ঘ সময় পর আলজেরিয়া এসে মাটিতে পা রাখার সুযোগ হয়। এখানে এসে তারা শক্তি সঞ্চয় করে তিলিমসান গিয়ে স্পেনীয়দের সাথে যুদ্ধ করে। তবে সফল হতে পারেনি।

খাইরুদ্দীনের সৌভাগ্য সেতারা উজ্জ্বল ছিলো। তার সামুদ্রিক সফলতা সুলতান সালিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। খোদ সুলতান তাকে পদাধিকারী অফিসারদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তাকে মূল্যবান পুরস্কার প্রদান করেন এবং কয়েকটি নৌযান প্রদান করেন। ১৫১৯ সালে স্পেনের আলজেরিয়ার উপর দ্বিতীয় হামলা সে প্রতিহত করে। কিন্তু ১৫২৯ সাল পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চল থেকে তাকে হটানো যায় নি। আলজেরিয়ার সামনে একটি দ্বীপ ছিলো যা চৌদ্দ বছর স্পেনের দখলে ছিলো। ঐ দ্বীপকে স্পেনের হাত থেকে মুক্ত করেন। আর একটি পূর্ণ নৌবহরকে গ্রেফতার করেন। খাইরুদ্দীন নিয়মিত কাজের রিপোর্ট কনস্টান্টিনোপল পাঠাতেন। সেখান থেকে যে আদেশ আসত তা পালন করতেন।

সুলতান সুলাইমান ও মহান দুই নাবিকের কীর্তি

সুলতান সালিমের পর সুলতানসুলাইমান শাসনে আসেন। তার সময়ে আরো দুজন মহান নাবিকের আবির্ভাব ঘটে। তারগুত পাশা ও পিয়ালি পাশা। তারগুত তার পেশাজীবন নিতান্তই ছোট একটি পেশা দিয়ে শুরু করে। প্রথমে সে ছোটখাটো নৌকার মাঝি ছিল। তারপর একসময় সে ত্রিশটি জাহাজের অধিনায়ক হয়ে উঠেন। সে এই ত্রিশটি জাহাজের একটি বহর বানিয়ে ক্রোসিকার উপর হামলা করে। তবে জেনেভা ও ভেনিসের নৌসেনাপতির হাতে তিনি বন্দি হন। পরে বারবারুসার হুমকিতে তার মুক্তি মেলে। তারপর বারবারুসার সাথে মিলে তিনি স্পেন ও ইতালির

উপর হামলা শুরু করে। মাত্র বিশটি জাহাজের এক নৌবহর দিয়ে ইতালি ও স্পেনের উপকূলীয় অঞ্চলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দেয়।

পিয়ালি পাশার কৃতিত্বও ইতিহাসের পাতায় অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি ওরান বিজয় করেন এবং ১৫৬০ সালে খৃস্টান বিশ্বের সম্মিলিত সামুদ্রিক শক্তি যা ত্রিপোলি ও ইসলামি দ্বীপ জিরবার সাথে যুদ্ধরত ছিল, তাদের উপর হামলা করে তাদেরকে পরাস্ত করে। এই খৃস্টান নৌবহরটি ২০০ নৌযানবিশিষ্ট ছিল এবং পোপের বিশেষ আদেশে সেখানে জেনেভা, ফ্লোরেন্স, মাল্টা, নাপলিস, সিসিলি, মোনাকোসহ বহু অঞ্চলের শাসকদের জাহাজ একসাথে ছিল। এই নৌবহরটি সেসময়ের এক দূরদর্শী ও প্রসিদ্ধ নাবিকের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানের দরুন নির্বিঘ্নে জিরবাহ দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। খৃস্টান বাহিনী জাহাজ থেকে নেমেছে এটা শুনেই পিয়ালি পাশা দারদানিলিস উপকূল আল্লাহর উপর ভরসা করে রওনা হয়ে যায়।এখানে এসেই সে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের নৌশক্তিকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। [১৩]

সাগরপথে হজ ও বাণিজ্যে বাধা

মুসলিমদের দুর্দশার নতুন অধ্যায়

ক্রুসেডারদের সবচে বড় ঘাঁটি ছিলো রোডিস দ্বীপ। যেখানে পোপের নেতৃত্বে তাবৎ খৃস্টানবিশ্বের আর্থিক সহযোগিতা এসে জমা হয়। আর সেই অর্থ দিয়ে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী ও মজবুত নৌবহর তৈরি করা হয়। এই দ্বীপের কেল্লা লোহা ও পাথর দিয়ে এমন মজবুতভাবে বানানো হয়েছে যে, কোনো সৈন্যদল তীরের কাছে শহরের ভেতরে গিয়েও তাদের সেনাশক্তিকে দুর্বল করা মুশকিল ছিল। তোপ বন্দুক ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে দুর্গের প্রতিটি কোনায় যেনো যমদূতের পাহারা বসানো হয়েছে। বিশাল বিশাল নোঙর ও শেকল দিয়ে সমুদ্রের দুয়ারে যেনো তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাবৎ খৃস্টানবিশ্বের পক্ষ থেকে ক্রুসেডার যোদ্ধাদেরকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেনো মুসলিমদের জাহাজগুলোকে কোনো দিক থেকেই

---

[১৩] এখানে উদ্ধৃত যাবতীয় তথ্য এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার বারবারুসা নিবন্ধ ও হিস্টোরিয়ান্স হিস্টোরি অব দা ওয়ার্ল্ড তুর্কি অধ্যায় থেকে গৃহীত হয়েছে।

যেতে না দেয় এবং তাদের বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে যেনো লুটে নেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, তারা ইসলামের বিজয়যাত্রাকে যেনো রুখে দিতে পারে সেই দায়িত্বও তাদের কাঁধেই ছিলো। তারা যেনো লক্ষ্য রাখে 'পবিত্রভূমি'র রক্ষাকর্তার গাফেলতির সুযোগে হামলা করে পবিত্রভূমিকে উদ্ধার করা যায় কি না। মুসলিমরা এই ধর্মডাকাতদের আক্রমণে মহা দুর্ভোগের শিকার হয়। হজের জন্যও তারা বের হতে পারত না। কোনো মুসলিম তাদের হাতে পড়ে গেলে তারা তাকে দাস-দাসী বানিয়ে বিক্রি করে দিত।[১৪]

সুলতান সুলাইমান স্পেনিশদের হাত থেকে একাধিক মুসলিম অঞ্চল উদ্ধার করলেন

৯২৮ হিজরি সালে সুলতান সুলাইমান দুই লাখ সৈন্য এবং ২৪৮ টি জাহাজের একটি নৌবহর নিয়ে (এতে মিসরের ২৪টি জাহাজ ছিল) কনস্টান্টিনোপল থেকে বের হন। রোডিস অবরোধ করেন। রোডিসের বীরেরা ফ্রান্স ও স্পেনের কাছে সাহায্য তলব করল। পোপও তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে খুব জোর তাগাদা দিয়ে চিঠি লেখলেন। কিন্তু দুই দেশের কেউই কোনো সাড়া দিল না। মাসের পর মাস অবরোধ জারি রেখে এবং বহু মুসলিমের শাহাদাতের বিনিময়ে রোডিস বিজয় হল। মুসলিম শিবিরে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। "মুমিনরা আল্লাহর সাহায্যে খুশি হয়" এ কথার ইতিহাস রচিত হল।

বছরের পর বছর যে অসংখ্য মুসলমান তাদের হাতে বন্দি ছিলো এবং যারা নিজেদের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল তাদেরকে আল্লাহ নিজ দয়া ও অনুগ্রহে ইসলামি খলিফার বিজয়ী সেনাদের মাধ্যমে স্বাধীনতার সুসংবাদ দিল। চুক্তি মুতাবেক সেন্ট জনের বীর সেনাদের তাদের এই ঘাঁটি ত্যাগ করতে হয়। পোপ তাদের নেতা ওচার হাজার নাইটকে ইতালিতে আশ্রয় দেন। তারপর স্পেন তাদের মালটায় নিয়ে তাদের দ্বিতীয় ঘাঁটি বানিয়ে দেয়।

---

[১৪]মুফতি ওয়াহলান বিরচিত আলফুতুহাতুল ইসলামিয়্যাহ ও আল ইলাম বিআলামি বাইতিল্লাহিল হারাম বইয়ের সুলতান সুলাইমান ও রোডিস দ্বীপ বিজয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তিউনিসিয়ার মুসলিমদের দুর্দশা

এরপর মুসলিমদের জন্য সামুদ্রিক রাস্তা কিছুটা ঝুঁকি ও বিপদমুক্ত হয়ে গেলো এবং স্পেনের মোকাবিলায় অগ্রসর হওয়া মুসলিমদের জন্য সহজ হয়ে গেলো। খাইরুদ্দীন পাশা আলজেরিয়ার পর তিউনিসিয়াকেও স্পেনিশদের দখল থেকে মুক্ত করে ইসলামি সুলতানের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসে। তারগুত পাশা স্পেনিশদের ত্রিপোলি থেকে বের করে দেন। এভাবে আফ্রিকার এই অঞ্চলটি ইসলামের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পায়।

তবে তারা হাত গুটিয়ে বসেছিলো, এমনটা ভাবলে ভুল হবে। এসব অঞ্চল পুনরুদ্ধার ও পুনরায় নিজেদের ক্ষমতায় আনতে স্পেনিশরা বড় বড় পরিকল্পনা করেছে। তবে একমাত্র তিউনিসিয়া ছাড়া তারা কোথাও সফল হতে পারেনি। তিউনিসিয়ার হাফসি সুলতান স্পেনিশদের সাথে আঁতাত করে তাদের দলভুক্ত হয়ে যায়। হালকুল ওয়াদি উপকূলে স্পেনিশরা জাহাজি টহল-নিয়ন্ত্রণ ও সামুদ্রিক দখল কায়েমে সক্ষম হয়। এই উপকূল থেকে বের হয়েই তারা শত্রুপক্ষের উপর অতর্কিত হামলা চালাত।

হাফসি সুলতান পলায়ন করে এখানে চলে আসে। স্পেনের যে দলটি মালটার যোদ্ধাদের নিয়ে হাফসি সুলতানের সহায়তার জন্য এসেছিলো তারা সাথে করে একটি চিঠি নিয়ে এসেছিল। সেই চিঠিতে স্পেনের বাদশাহর শর্তনামা ছিল। শর্তনামা পড়ে সুলতান অবাক হয়ে গেলেন। শর্তনামার খোলাসা ছিল, হাফসি সুলতান নামেমাত্র সুলতান থাকবে। কিন্তু রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্তৃত্ব থাকবে স্পেনের হাতে।

স্পেনের সেনারা তিউনিসিয়ার উপর হামলা করেছে। খাইরুদ্দীন পাশার ছোট দলটি পরাজয় বরণ করেছে। পাশা লড়াই করে প্রাণ নিয়ে কনস্টান্টিনোপলে চলে যান। স্পেন সমগ্র দেশ দখল করে নেয়। দখল করেই তারা আন্দালুসে নির্যাতনের যে আমানুষিক ইতিহাস রচনা করেছিল তার পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। মুসলিমদের নির্বিচারে হত্যা করতে লাগল। মসজিদ ও ইমারাত ধ্বংস করতে লাগল। লাইব্রেরি ধ্বংস করতে লাগল। নারীদের আব্রু লুণ্ঠন করতে লাগল। মানুষকে জোর করে খৃস্টান বানানো শুরু করল। জামে মসজিদগুলোকে গির্জায় রূপান্তরিত করা শুরু করল। ইতিহাসকারগণ লেখেন, এতো গ্রন্থ রাস্তার মাঝখানে পড়েছিল যে, গ্রন্থের স্তূপ পদদলিত না করে কেউ জামে মসজিদে যেতে পারত না। আজানের মিনারে গির্জার ঘণ্টা লাগানো হল। মুসলিমদের ঘর ও সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে

খৃস্টানদের দিয়ে দেওয়া হল। ইতিহাসবিদ ইবনে আবিদিনার খুবই মর্মান্তিকভাবে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

তিউনিসিয়াকে স্পেনশিদের হাত থেকে উদ্ধার

মোটকথা অল্প কয়েক বছরে মুসলিমরা নিজের দেশে পরদেশী হয়ে গেলো। স্পেনিশদের এই নৃশংতার প্রভাব আশেপাশের তুর্কিশাসিত ইসলামি দেশগুলোতেও পড়তে লাগলো। কাইরাওয়ানে হায়দার পাশা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু শহরের উলামা ও গণ্যমান্যরা তাকে সাহস জোগালো এবং একপর্যায়ে আল্লাহ কাইরাওয়ানের মুসলিমদের অন্তরে আত্মবিশ্বাস ঢেলে দিলো। তারা সমগ্র আফ্রিকায় জিহাদ ঘোষণা করল আলজেরিয়া ও ত্রিপোলি থেকে প্রচুর মুসলমান দলে দলে যুদ্ধে যোগ দিল। কাইরাওয়ান ত্রিপোলি ও আলজেরিয়া এই তিন দেশের যোদ্ধারা একযোগে তিউনিসিয়ার দিকে যাত্রা করল এবং স্পেনিশদের সাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু যেহেতু স্পেনিশদের সাথে নতুন যোদ্ধারা সময়ে সময়ে যুক্ত হচ্ছিল এবং আরব মুরতাদ গোত্রগুলো তাদেরকে সহযোগিতা করছিল তাই মুসলিম সেনাদের জয় কষ্টসাধ্য হয়ে গেল। কিন্তু স্পেনিশদের জয়ও সহজসাধ্য ছিলো না।

পলায়নপর মুসলিমদের সহায়তায় উসমানিরা

কিছুদিন পর মুসলিমদের দৃঢ়তায় চিড় ধরতে শুরু করল। আত্মবিশ্বাসে দুর্বলতা দেখা দিতে লাগল। একপর্যায়ে তারা ঠিক করে ফেলল রাতের অন্ধকারে তারা ক্যাম্প খালি করে নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু রব্বুল ইজ্জতের ইচ্ছা ছিল অন্য কিছু। তারা যখন পলায়নের ইচ্ছায় ক্যাম্প ত্যাগ করছিল তখন হঠাৎ সমুদ্রের দিগন্তে এক সুবিশাল সৈন্য বহর উপকূল থেকে দৃষ্টিগোচর হল। মুসলমানদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এটা হয়তো স্পেনের নতুন সহযোগী বহর। মুসলিমদের আগামীকাল পলায়নের ইচ্ছাটা আরো দৃঢ় হল। কিন্তু রাতের অন্ধকারে আশার আলোয় উদ্ভাসিত হল, এ রাতের তারাটি তো পশ্চিম থেকে নয়, পূর্ব থেকে উদিত হয়েছে। এ তো ইসলামের সেতারা। অর্থাৎ এ নৌবহরটি কনস্টান্টিনোপলের উসমানি নৌবহর, মুসলিমদের সহযোগিতার জন্য এসেছে। সাগরতীরের কয়েকজন মাঝি যখন সুসংবাদটি নিয়ে ভগ্নহৃদয় মুসলিমদের কাছে এল। তখন সবার মনের আওয়াজ মুখে এসে উচ্চশব্দে ধ্বনিত হল আল্লাহু আকবার! আলি পাশা ও সিনান পাশা এই নৌবহরের প্রধান অফিসার ছিলেন। ছোট বড় দেড়

হাজার নৌযান এই বহরে শামিল ছিল। যেদিন এই নৌবহর কনস্টান্টিনোপল থেকে মুসলিমদের সাহায্যের জন্য রওনা হলো সেদিন অনেক মুসলিম যুবক-যুবতী শিশু বৃদ্ধ আশায় বুক বেঁধে তাদেরকে আল্লাহর পথে বিদায় দিতে সাগরতীর পর্যন্ত এসেছিল।

আল্লাহর কী অপার মহিমা! ঐ দিনই কাইরাওয়ান থেকে হায়দার পাশা ত্রিপোলি থেকে মুসতফা পাশা সৈন্য বাহিনি নিয়ে তিউনিসিয়া পৌছে যায়। এভাবে জলপথে ও স্থলপথে উভয় পথেই উসমানি সৈন্যরা স্পেনের উপর হামলা করে বসে। স্পেনীয়রা প্রচুর রক্তপাত ও তুমুল যুদ্ধের পর শহর খালি করে দেয়। আর সেই প্রসিদ্ধ দুর্গে তারা আশ্রয় নেয়, যা তারা ৯৩৬ খৃস্টাব্দে দখল করেছিলো। পূর্ণ ৩৫ বছর যেটার নির্মাণে তারা ব্যস্ত ছিল। তুর্কি মুজাহিদগণ ৩৭ দিনেই তা বিজয় করে ফেলে। এই কেল্লার বিজয়ে বীরত্ব ও যুদ্ধবিদ্যার যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করে, আফ্রিকান ঐতিহাসিকগণ তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এভাবে তুমুল যুদ্ধ ও হাজার হাজার তুর্কিপ্রাণের অমূল্য আত্মত্যাগের পর কুফুরি শক্তির ঘনঘোর অন্ধকার তিউনিসিয়ার আকাশ থেকে বিদূরিত হয়ে যায় এবং ইসলামের কালেমা এদেশে পুনর্বার উচ্চকিত হয়।

ইমাম ইবনে আবি দিনারের বর্ণনায় উসমানিদের তিউনিসিয়া-বিজয়

তিউনিসিয়ার বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ইমাম ইবনে আবি দিনার তার নিজ দেশেরএই ঘটনাকে যে উদ্যম ও আনন্দের সাথে বর্ণনা করেছেন তা এখানে উল্লেখ না করলে পাঠকদের প্রতি অবিচার হবে–

> আল্লাহ সালতানাতে উসমানিয়াকে দীর্ঘজীবী করুন। কারণ এই খেলাফতের দীর্ঘতার উসিলায় মুসলিমদের মান-মর্যাদা দীর্ঘকাল টিকে থাকবে। আর এর তরবারির তীক্ষ্ণতাকে কাফির ও মুনাফিকদের মুণ্ডপাতকারী বানাক।... আল্লাহ যদি এই মহান সুলতানের মাধ্যমে এই দেশকে না বাঁচাতেন তাহলে এদেশের অধিকাংশ মানুষ কুফুরের অন্ধকারে নিমজ্জিত হতো। তখন এখানে ইসলামের আর কোনো অস্তিত্ব থাকতো না।[১৫]

---

[১৫] পৃষ্ঠা ১৮৩,আল মুনিস ফি আখবারি আফ্রিকিয়া ওয়া তিউনিস, ইবনে আবি দিনার

যেহেতু তুর্কিদের নৌবহর সঠিক সময়ে পৌঁছেছে তাই লোকেদের মধ্যে আজব আজব কল্পনার উদ্রেক হতে লাগলো। কেউ কেউ বলতে লাগলো এরা মূলত গ্রানাডার সহায়তার জন্য বের হয়েছিলো; কিন্তু যখন জানা গেলো গ্রানাডার পতন হয়েছে তখন তারা এদিকে চলে এসেছে। কেউ বলতে লাগলো তিউনিসিয়ার মাটিতে মুহরিজ বিন খালাফ নামে একজন বুজুর্গ ব্যক্তি আছেন তিনি সুলতানকে স্বপ্নে এখানে সেনা পাঠানোর নির্দেশনা দিয়েছেন। যাই হোক, আসল কথা হলো তুর্কিদের এই কৃতিত্ব চিরকাল মানুষ স্মরণ রাখবে।

স্পেনে উসমানিদের পুনরায় আক্রমণ

স্পেনের কাছ থেকে বদলা নেওয়ার নতুন আরেকটা উপায় আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের সামনে খুলে দিলেন। স্পেন মুসলিমদের রক্তপাত ও হত্যার ক্ষেত্রে যে পৈশাচিক নৈপুণ্য ও অমানুষিক দক্ষতা প্রদর্শন করেছে তার বদৌলতে স্পেন পোপের কাছে খুব প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এজন্য অস্ট্রিয়া জার্মানি ও ইতালি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল তার দখলে চলে আসে। এমনকি জেনেভা, ফ্লোরেন্স, সিসিলি, ভেনিস পর্যন্ত তার দখলে ছিল। স্পেনের শাসককে বলা হতো সম্রাট, শাহেনশাহ। ফ্রান্স স্পেনের এই বিশাল সাম্রাজ্য কেনিজের জন্য হুমকি মনে করতো। নিজেকে সংকটাপন্ন মনে করতো। উপায়ান্তর না দেখে ফ্রান্স খেলাফতে উসমানিয়ার আশ্রয় কামনা করলো।

খাইরুদ্দীন পাশা স্পেনের হামলা থেকে পালিয়ে তিউনিসিয়া থেকে বের হয়ে স্পেনিশ সাম্রাজ্যের অন্য আরেকটি দ্বীপের উপর হামলা করেন। স্পেনের ম্যানোরকা দ্বীপটি স্পেনীয়দের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কনস্টান্টিনোপল চলে আসেন। সুলতান ফ্রান্সের দাবি পূরণার্থে স্পেনের দখলকৃত ভূখণ্ডের উপর জল ও স্থলপথে উভয় দিক থেকে হামলা শুরু করল। হাঙ্গেরি স্পেনের মিত্র ছিল। আর স্পেনের সাম্রাজ্য অস্ট্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুলতান স্থলপথে হাঙ্গেরির উপর হামলা করলেন। তাকে পদানত করে অস্ট্রিয়ার রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। ফ্রান্স আরেকদিক থেকে স্পেনের উপর হামলা করে বসল। খাইরুদ্দীন স্পেনের অধিকৃত দ্বীপসমূহ ও সামুদ্রিক ঘাঁটিসমূহে প্রচণ্ড হামলা শুরু করে দিল।

মাজমাউল জাযায়েরের (সম্মিলিত দ্বীপপুঞ্জ) প্রায় সব দ্বীপ ভেনিস থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। খৃস্টাব্দে স্পেনিশদের থেকে কোলরোঁ পুনর্বার উদ্ধার করেন। ১৫৩৮ খৃস্টাব্দে যৎসামান্য সেনাশক্তি নিয়ে পোপ ভেনিস ও স্পেনের সম্মিলিত নৌবহরকে পরাজিত করে। এই বিজয়ে সামুদ্রিক যুদ্ধে মুসলিমরা এমন যুদ্ধনৈপুণ্য ও কৌশল প্রদর্শন করে পরবর্তীতে নেলসন প্রমুখ যোদ্ধাগণ সে যুদ্ধকৌশল অনুসরণ করে। ১৫৪১ খৃস্টাব্দে স্পেন পুনরায় আলজেরিয়া হামলা করার পরিকল্পনা করে। সুলতান সুলাইমান একটি নৌবহরসহ খাইরুদ্দীনকে সেখানে প্রেরণ করেন।

পাঠকগণ আগেই জেনেছেন, ফ্রান্সের সাহায্যের জন্য সুলতান যখন বের হলেন তখন খাইরুদ্দীনের হাতে ছিল উসামানি নৌ বাহিনীর বাগডোর নিজের হাতে নিয়ে নেন। ফ্রান্সকে সাথে নিয়ে স্পেন এবং তার অনুগত দেশগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে শুরু করেন। ফ্রান্সের নৌবহরের সেনাদের অদক্ষতা সত্ত্বেও তারা প্রতিপক্ষকে নাকাল করে দেয়।

ফ্রান্স ক্যাথলিক বিশ্বাসের প্রথম প্রজন্ম হিসেবে গর্ব করতো। সেই ফ্রান্স ইসলামের খলিফার অধীনস্থ হয়ে খৃস্টানদের প্রাণাধিক ও প্রসিদ্ধ স্পেনীয় খৃস্টান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরিক হওয়ার দরুন ফ্রান্স সমগ্র খৃস্টানবিশ্বের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হল। বাধ্য হয়ে অবশেষে তাকে মুসলিমদের সহযোগিতা ও মিত্রতার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হল। কিন্তু এতোকিছু সত্ত্বেও এই সুযোগে ফ্রান্স উসমানি সালতানাতের সাথে চুক্তির এমন দস্তাবেজ হস্তগত করে নিয়েছে যা আজ ইউরোপিয়ান জাতিসমূহের বিশেষ শক্তিও তুর্কিদের দুর্ভাগ্যের জগদ্দল পাথর হয়ে দেখা দিয়েছে।

সিনান পাশা

৯৩৭ হিজরিতে সিনান পাশা জিরবা দ্বীপের উপর হামলা করে; যা স্পেনের কর্তৃত্বাধীন ছিলো এবং আফ্রিকার জন্য এই দ্বীপটি প্রধান ফটকের মতো ছিলো। তিন মাস অবরোধের পর দ্বীপটি বিজিত হয়। প্রতিহিংসার বশে স্পেন আলজেরিয়ার উসমানি উপকূলে এবং জাহাজের উপর হামলা শুরু করে। সুলতান এর বদলাস্বরূপ মাল্টায় হামলা করার ইচ্ছা করেন। মাল্টার (যেমনটা আমরা আগেই বলেছি, স্পেন মাল্টাকে খৃস্টান ক্রসেডারদের ঘাঁটি বানিয়ে ছিল।) উপর হামলার জন্য সিনান পাশা ৯৭৩ হিজরিতে ১৮১ টি জাহাজের নৌবহর নিয়ে রওনা হন। কিন্তু হামলা সুতীব্র হওয়া সত্ত্বেও এবং

কঠিন ও কঠোর অবরোধ সত্ত্বেও দ্বীপটিকে জয় করতে পারেনি। এই যুদ্ধে সেন্ট জনের খৃস্টান ক্রুসেডাররা খৃস্টান ঘৃণ্যাচারের নৃশংস নির্দশন দেখিয়েছে। তারা মুসলিম কয়েদিদের দেহ গোলা বারুদের বদলে তোপের মুখে রেখে তার মুসলিম ভাইয়ের কোলে নিক্ষেপ করে।

সুলতান দ্বিতীয় সালিম

সুলতান সুলাইমানের পর দ্বিতীয় সালিম শাসনে এলো। দ্বিতীয় সালিম ভেনিসের দ্বীপগুলোর বিপক্ষে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিলো। যে দ্বীপগুলো একদিক থেকে ধারাবাহিকভাবে মিসর শামের সাথে মিলিত হয় এবং অন্যদিকে উত্তর আফ্রিকার মুসলিমদের রাস্তায় বাঁধা সৃষ্টি করছিল। ৯৭৬ মোতাবেক ১৫৭০ খৃস্টাব্দে পিয়ালি পাশা ও মুস্তফা পাশা সাইপ্রাসের উপর হামলা করে এবং ভেনিস থেকে তা ছিনিয়ে নেয়। এখান থেকে ফিরে মুসলিমরা ক্রিটির উপকূলে এসে অবরোধ শুরু করে। উসমানি নৌবহরে ৩০০ জাহাজ ছিল। কিন্তু জাহাজের জন্য মওসুম অনুকূল না হওয়ায় ক্রিটির অবরোধ পরিহার করে। মৌসুমি হাওয়ার কারণে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠে। উসমানি জাহাজগুলো একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

মানুষ হত্যার দিনটিকে জাতীয় উৎসব ঘোষণা

খৃস্টানদের একটি সম্মিলিত নৌবহর তৈরী হতে লাগল; যার নেতৃত্ব স্পেন-সম্রাটের ঐ অবৈধ সন্তানের হাতে দেওয়া হল, যে আন্দালুসের মুসলিমদের হত্যা ও নিধন করে খৃস্টান সমাজে প্রচুর বাহবা ও সুনাম কুড়িয়েছিলো। খৃস্টান ক্রসেডারদের নৌবহরে স্পেনের ১৪০টি, ভেনিস ও পোপের ১৩ টি এবং মাল্টার ৯টি জাহাজ ছিল। এরা অতর্কিতভাবে মুসলিম নৌবহরের উপর হামলা করে বসে। মুসলিমদের ভেতর আচমকা হামলার দরুন বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও তারা পালানোর বদলে শত্রুদের মোকাবিলা করাকেই যথোপযুক্ত মনে করল। কিন্তু শত্রুপক্ষের হামলার উপযুক্ত জবাব দিতে তারা ছিল অক্ষম বিধায় পরাজয় বরণ করতে হল। মুসলিমদের ১৩০টি জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ৯৪ টি জাহাজ ডুবে যায়। ৪০০ তোপ ক্রসেডাররা নিয়ে নেয়। ৩০ হাজার মুসলিম গ্রেফতার হয়। সমগ্র খৃস্টানবিশ্বে এই বিজয়ের আনন্দোৎসব পালিত হয়। স্পেন এই দিনটিকে আনন্দের দিবস এবং ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসবের দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়। পোপ সেন্ট পিটার গির্জায় গিয়ে ভাষণ দেন এবং সম্রাটের অবৈধ

সন্তানের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। এই ঘটনার স্মারকস্বরূপ এই দিনটিতে স্পেনে উৎসব পালিত হয়।

কনস্টান্টিনোপলে শোকের ছায়া ও স্পেনের পতনের সূচনা

এই ঘটনার খবর কনস্টান্টিনোপল পৌঁছা মাত্রই মুসলিমদের ভেতর শোকের ছায়া নেমে আসে। মুসলিমদের ভেতর দেখা দেয় প্রচণ্ড উত্তেজনা। তারা তৎক্ষণাৎই হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। কিন্তু সুলতান খুবই বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার সাথে এর প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করলেন। ঐ বছরই উসমানিরা ২৫০ জাহাজের একটি নৌবহর তৈরি করে। এই বহরটি রওনা হওয়ার পূর্বেই অদৃশ্য প্রতিশোধ শুরু হয়ে যায়। স্পেন ও ভেনিসের একতা ভেঙ্গে যায়। ভেনিস কয়েকটি দ্বীপ তুর্কিদের উপহার দিয়ে তাদের সাথে সন্ধি করে নেয়। স্পেন তিউনিসিয়ার দিকে মনোনিবেশ করল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাদের যে পরিণতি বরণ করতে হয়েছিলো, তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ইত্যবসরে স্পেনের এক নতুন শত্রু ইংল্যান্ডের আবির্ভাব ঘটে। সেও স্পেনের সামুদ্রিক শক্তি মোকাবিলার জন্য উসমানি খেলাফতের কাছে অনুরোধ করে। পরিশেষে এসব যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্পেনের অনমনীয় স্পর্ধার অবসান ঘটে। [১৬]

উত্তর আফ্রিকা মুসলিমদের দখলে

আফ্রিকার সকল ইসলামি ভূখণ্ড তথা আলজেরিয়া, ত্রিপোলি , তিউনিসিয়া, তিলিমসান, কাইরাওয়ান এখন উসমানি সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসলো। খলিফার নাম খুতবায় সব জায়গায় উচ্চারিত হতে লাগলো । সেসময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সবখানে এই রীতি অনুসরণ করা হয়। 'মুনিস ফি আখবারি তিউনিস' নামক গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়–

"খুতবার মিম্বারে উসমানি সুলতানদের নাম নেওয়া হয়।"

উসমানিদের প্রতিপক্ষ যখন মুসলিম বাদশাহ

উত্তর আফ্রিকায় কেবল মারাকেশ বাকি রইল। মারাকেশের উপকূলে স্পেন ও পর্তুগালের এক প্রকারের আধিপত্য ছিল। কিন্তু দেশের অভ্যন্তর সুরক্ষিত

---

[১৬] এসব ঘটনা তারিখে দাওলাতে উসমানিয়া, ফরিদ বে এবং হিস্টোরিন্স হিস্টোরি অব দা ওয়ার্ল্ড থেকে গৃহীত হয়েছে।)

ছিল। এক তুর্কি নৌসেনাপতি তাদেরকে উপকূল থেকেও বের করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু যেহেতু খোদ মারাকেশবাসী থেকে কোনো সহযোগিতা পাওয়া গেল না তাই সফলতা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আগেই বলা হয়েছে মারাকেশের ক্ষমতাধর মুসলিমদের দুটি খান্দান - ওয়াতাসিয়্যিন ও সাদিয়্যিন- দেশের ক্ষমতা নিয়ে পরস্পরে বিবদমান ছিলো, এই সুযোগে পর্তুগিজরা উপকূলে ধীরে ধীরে নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার করছিলো। এই ফাঁকে আফ্রিকারঅন্য উপকূলে উসমানি মুজাহিদগণ খৃস্টান সেনাদের বের করে দিয়েছিলো। এক দরবেশ আলেম শেখ সাদি জিহাদের নামে পতাকা উত্তোলন করলেন। তার পাশে লোকজন সমবেত হতে লাগল । মরক্কোর বাদশাহ আবু হাসুন ওয়াতাসি সুলতান শেখ সাদির কাছ থেকে পলায়ন করে আলজেরিয়ায় তুর্কিদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলো। সুলতান শেখ সাদি ফন্দি করলেন কী করে তুর্কিদেরকে এতদঞ্চল থেকে বের করা যায়। তিলিমসান খাইরুদ্দীন পাশার ছেলে হাসান পাশার হাতে ছিলো। শেখ সাদি সেখানে হামলা করল এবং নয় মাসের অবরোধের পর তা জয় করল। কিন্তু তুর্কিরা খুব জলদিই তা আবার পুনরুদ্ধার করে নেয়। শেখ সাদি দ্বিতীয়বার আবার হামলা করতে চাইলে উসমানি সুলতান সন্ধির প্রস্তাব করলেন।

আশা করি পাঠকরা ভুলে যাননি, উসমানি সুলতানদের যেহেতু অন্য একটি মহৎ লক্ষ্য রয়েছে তাই তারা মুসলিমদের পারস্পরিক যুদ্ধকে অপছন্দ করতেন। এজন্যই তুর্কিরা নিজেদের পক্ষ থেকে সেই অঞ্চলের একজন বড় ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল খারুবি আল তরাবলিসিকে সন্ধির বার্তা দিয়ে সুলতান শেখ সাদির কাছে পাঠালেন। শেখ সাদি যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করলেন; কিন্তু সন্ধির বার্তা গ্রহণ করলেন না।

আবু হাসুন ওয়াতাসি উসমানি খলিফাদের আনুগত্য, তাদের নামে খুতবা ও তাদের মুদ্রা গ্রহণ করে নিলেন। তুর্কিরা ওয়াতাসিকে সহযোগিতা করল। ৯৬১ সালে তাদের সাহায্যে সে ফাস দখল করে নিল। সুলতান শেখ সাদিকে সেখান থেকে বের করে দিলেন। কিন্তু সাদি ঐ বছরই ফাস আবার দখল করেন। ওয়াতাসির সাথে যে তুর্কি অফিসার ও সিপাহিগণ ফাসে এসেছিলেন তারা সাদির অধীনে চাকরি করা শুরু করে দিলেন। সুলতান সুলাইমান যখন জানতে পারলেন ওয়াতাসি খানদান শেষ হয়ে গেছে এবং শেখ সাদি সম্পূর্ণ দেশে একচ্ছত্র আধিপত্য করছেন এবং সেখানকার সর্বজনমান্য শাসকে পরিণত হয়েছেন তখন সুলতান তাকে শুভেচ্ছানামা

পাঠালেন এবং সন্ধিপত্র দিয়ে একজন দূত পাঠালেন। চিঠিতে লেখলেন ওয়াতাসির মতো আপনিও আমার নামের খুতবা পড়ুন এবং মুদ্রায় আমার নাম লিখুন।

সাদি একথা শুনে অনেক রাগান্বিত হলেন এবং সুলতানকে নিয়ে কটুকথা বলতে লাগলেন। দূতকে বললেন, সুলতানকে বলবে আমি স্বয়ং মিসরে গিয়ে সুলতানকে জবাব দিবো। সুলতান সুলাইমানের সামুদ্রিক শক্তিকে বিদ্রূপ করে দরবারে তাকে 'মৎস-সম্রাট' আখ্যা দিলেন। সুলতান এই তিক্ত ও তীর্যক জবাব শুনে অস্থির হয়ে উঠলেন এবং বললেন, এখনই উসমানি নৌবহর মারাকেশের দিকে রওনা কর। প্রধানমন্ত্রী নিবেদন করলেন, এই সামান্য কাজের জন্য সেনাবাহিনির দরকার নেই। এই অসভ্য লোকটির মাথা আপনার পদে নিবেদন করতে আপনার কয়েকজন 'জাননেসারি' (আত্মোৎসর্গকারী) সৈন্যই যথেষ্ট। অবশেষে ঘটনা এমনটাই ঘটল। সুযোগ পেয়ে কয়েকজন তুর্কি সাদির[১৭] মাথা কেটে কনস্টান্টিনোপল পাঠিয়ে দেয়। সাদির জায়গায় ৯৬৫ হিজরিতে তার ছেলে গালিব বিল্লাহ উপাধি নিয়ে পিতার জায়গায় আসীন হন। তিলিমসানের শাসক হাসান পাশা গালিব বিল্লাহর উপর আক্রমণ করলো। গালিব বিল্লাহকে পরাজিত করতে না পেরে হাসান পাশা ফিরে আসেন।

'Historians` History of The World' গ্রন্থের রচয়িতাগণের ভাষায় এসব ঘটনার মূল্যায়ন হলো–

> মারাকেশে উসমানি ও সাদি ধর্মীয় নেতৃত্বের জন্য পরস্পরে দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা ছিল।[১৮]

তুর্কিদের সামনে এই ধর্মীয় নেতৃত্ব বিবাদ মীমাংসার একটা ভালো সুযোগ তৈরি হয়। গালিব বিল্লাহ ভাই মুতাসিম বিল্লাহ তার ভাইয়ের আচরণে মনক্ষুণ্ন হয়ে কনস্টান্টিনোপল চলে আসেন। সুলতান দ্বিতীয় সালিমের[১৯] কাছে গিয়ে নিবেদন করেন সেযেনো তার বাবার দেশ দখল করতে পারে । সুলতান অনেক গড়িমসি করলেন। কিন্তু তার অনেক পীড়াপীড়ি করার দরুন সুলতান রাজি হতে বাধ্য হলেন মুতাসিম তুর্কিদের সেনা নিয়ে

---

[১৭] সম্ভবত লিপিকার ভুলবশত মূল বইয়োসাদির বদলে ওয়াতাসি লিখেছেন। আল্লাহু আলামু
[১৮] ২৪ খণ্ড ২৭০ পৃষ্ঠা
[১৯] ১৫২৪-১৫৭৪

মারাকেশে প্রবেশ করলো। নিজের ভাইকে পরাজিত করে সে সিংহাসনে উপবিষ্ট হলো।

মারাকেশে উসমানিদের ভূমিকা

মুতাসিমের পর মানসুরের শাসনামল শুরু হল। মানসুর পর্তুগিজদের বিপক্ষে বিশাল বিজয় লাভ করেন। এই সুসংবাদ কনস্টান্টিনোপলে তৃতীয় মুরাদ[২০] বিন সালিমের কাছে প্রেরণ করেন। সুলতান এই সংবাদে খুব খুশি হন এবং মানসুরকে প্রচুর উপহার-উপঢৌকন প্রদান করেন। কিন্তু মুরাদের প্রেরিত উপঢৌকন ও প্রধিনিধি দলের যথাযথ মর্যাদা মানসুর করতে পারেননি। তাই সুলতান মুরাদ ক্ষুব্ধ হন এবং দরবারের কয়েকজন সভাসদও মুরাদকে উস্কানি দেয়। মুরাদ ক্রুদ্ধ হয়ে মানসুরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নৌবহর প্রেরণের আদেশ দেন। এখবর শুনে মানসুর খুব চিন্তায় পড়ে যান। সে কয়েকজন আলেম ও দরবারের সভাসদের একটি প্রতিনিধি দল কনস্টান্টিনোপল প্রেরণ করলেন। এই প্রতিনিধি দল যখন সুলতান মুরাদের দরবারে পৌঁছল সুলতান অনেক খুশি হলেন। নৌবহরকে ফেরত আসার হুকুম দিলেন। একইভাবে সুলতান ও নিজের প্রতিনিধি দল মানসুরের দরবারে পাঠান। মানসুর তাদেরকে এবারখুব খাতির-যত্ন করেন। তাদের সাথে বিখ্যাত কাজি ইমাম ইবনে আলি শাতেবি এবং সেনাপতি আব্দুর রহমানকে পাঠান। ইমাম শাতেবি তার নিজের দায়িত্ব ও সম্পূর্ণ উম্মাতে মুসলিমার দায়িত্ব খুবই নিপুণ ও নিখুঁতভাবে আদায় করেন। উম্মতে মুসলিমার একতার গুরুত্ব ও আহলে বাইতের প্রশংসা ও মর্যাদা এতোটাই মনোমুগ্ধকরভাবে বর্ণনা করেন যে সুলতান মুরাদ নেহায়েত উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত হন। এরপর থেকে মানসুর ও উসমানি সালতানাতের সাথে একতা ও ভরসা এতোটাই বেড়ে যায় যে, তাদের মধ্যে পরস্পরে চিঠিপত্র ও উপহার-উপঢৌকন প্রেরণের রীতি সবসময়ের জন্য চালু হয়ে যায়। এমনকি সুলতান মুরাদ একবার মানসুরকে চিঠি লেখে বলেন, আমি ঠিক করেছি আপনার সাথে মোসাফাহা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে বা কারণে আমি হাত প্রসারিত করব না। দুই সালতানাতের দূতগণ সবসময় একে অপরের কাছে আসা-যাওয়া করতো।

---

[২০]১৫৪৬-১৫৯৫

তারপর মারাকেশে আমিরদের দ্বিতীয় সালতানাত কায়েম হয়। যা এখনো নামসর্বস্ব টিকে আছে। তাদের মধ্যে চিঠিপত্র ও উপহার প্রেরণের রসম তৈরি হয়। একে অপরের উপর বন্ধুত্বসুলভ ভরসা অটুট আছে। সুলতান মুস্তফা খান উসমানি[২১] ১১৮০ হিজরিতে মারাকেশে সবচে বড় উপহার প্রেরণ করেন। মারাকেশের সামরিক দুর্বলতার প্রতি লক্ষ করে সুলতান তাদেরকে অনেক মূল্যবান উপহার প্রদান করেন। সুলতান নিজের কিছু অভিজ্ঞ যোদ্ধা এবং সামুদ্রিক অফিসার ও নাবিক পাঠান। সামুদ্রিক যন্ত্রপাতি, তোপ এবং প্রশিক্ষক, কারিগর, জাহাজ নির্মাণে ও বোম বানাতে দক্ষ কর্মীসহ আরো অনেক নতুন নতুন প্রযুক্তি ও তার প্রশিক্ষক দান করেন। তবে সবচে দুর্ভাগ্যের কথা হল, এতো উপহার পেয়েও মারাকেশের সুলতান সমৃদ্ধ ও সন্তুষ্ট হতে পারলো না। এই উপহার তার অলসতা ও উদাসীনতার নিয়তি বয়ে আনলো। আর তার পরিণতি আজ আমাদের সামনে স্পষ্ট। এতদসত্ত্বেও উসমানি খলিফাগণ মুসলিমবিশ্বের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটির প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কখনো ভুলেননি। [২২]

---

[২১] সম্ভবত লেখক এখানে তৃতীয় মুস্তাফার কথা বলছেন। তার জন্ম, ১৭১৭ এবং মৃত্যু ১৭৭৪ খৃস্টাব্দে।

[২২] দেখুন, আল ইস্তিকসা লি আখবারিল মাগরিবিল আকসা খণ্ড ৩, ৪

আরব-ভারত সাগরে সাম্রাজ্যবাদী পর্তুগিজ দস্যুদের মোকাবিলায় উসমানিগণ

পর্তুগিজদের সামুদ্রিক আবিষ্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্য

তদানীন্তন সময়ে স্পেনের পর ইসলামের প্রতিপক্ষদের সারিতে স্পেনের পরবর্তী স্থানটি পর্তুগালের। এই অঞ্চলটি যেহেতু স্পেনের পার্শ্ববর্তী তাই ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে সে কখনো স্পেন থেকে পৃথক হয়ে আবার কখনো স্পেনের অংশ হয়ে হাজির হয়েছে। ইতিহাসের যেই সময়টির কথা আমরা বলছি সেই সময়েও পর্তুগাল স্পেনের অংশ ছিলো। সেজন্যই পর্তুগিজ ভাষায় অতীতে ও বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে আরবি শব্দের উপস্থিতি রয়েছে। স্পেন যখন ইসলাম নিধনের কাজ শুরু করেছে পর্তুগালও তখন তার সম্পূর্ণ অনুসরণ করেছে। আমরা আগেও বলেছি, পর্তুগাল প্রথমে মারাকেশ উপকূলীয় অঞ্চলে তার দখল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো কিন্তু আরব ও তুর্কিদের হামলার জন্য সেখান থেকে পালাতে হয়েছে। এটাও আমরা বলেছি, রোম সাগর মিসর ও লোহিত সাগর দিয়ে ইউরোপ ও এশিয়ার যে পুরাতন সমুদ্রপথ ছিল তার উপর তুর্কিরা নিজেদের ক্ষমতার সামুদ্রিক ফটক নির্মাণ করে রেখেছিলো। সেজন্য পূর্বাঞ্চলীয় ইসলামি দেশগুলোকে পদানত করতে অন্য রাস্তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সুতরাং শুরুতে পর্তুগিজ সামুদ্রিক আবিষ্কারকগণ যেসব কারণে নতুন সামুদ্রিক পথ আবিষ্কারের জন্য মরিয়া ও পেরেশান ছিল তার মধ্য সবচে বড় কারণ হল তুর্কিদের থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে 'পবিত্রভূমি'তে যাওয়ার একটি রাস্তা অনুসন্ধান ও বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করার জন্য বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদ সঞ্চয় করা এবং পূর্বাপেক্ষা আরো বেশি নিপীড়ন ও হত্যা, লুণ্ঠনের জন্য মুসলমানদের নতুন কোনো ভূখণ্ড তালাশ করা। যেমনটা এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা 'Historians' History of The World' গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করে দেখিয়েছিলাম। তার কিছু অংশ এখানে পুনরায় উল্লেখ করবো,

খৃস্টান বিশ্বের অপরিমেয় শক্তিমত্তার মূলমন্ত্র ছিল প্রাচ্যের দ্বীপসমূহে ও আধুনিক বিশ্বে স্পেন ও পর্তুগালের সামুদ্রিক আবিষ্কার ও ধারাবাহিক বিজয়। পাশাপাশি প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও আধুনিক সাহিত্যের আলোকোজ্জ্বল আবির্ভাব, মুদ্রণশিল্পের বদৌলতে এনলাইটেনমেন্ট গবেষণা ও আধুনিক জ্ঞানের উন্নতি ইত্যাদি সকল বিষয় খৃস্টান বিশ্বের প্রাণশক্তিকে আরো প্রবলভাবে সমুন্নত করেছে। যার ফলে তাদের আবেগ আরো সংকল্পপূর্ণ হয় এবং কর্মক্ষেত্রের জটিল পরিস্থিতিতে আরো সহিষ্ণু ও শ্রমকষ্ট সহ্য করতে আরো প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। এছাড়াও আরো এমন উপকরণের দেখা মিলে যার দ্বারা বোঝা যায় যে ইউরোপবাসীদের এই নতুন শক্তি ইসলামি দেশগুলো বিজয়ে কাজে আসবে। কারণ সেসময়েও ধর্মীয় আবেগ ব্যাপক ও মজবুত ছিল। সামুদ্রিক পরিব্রাজকদের আবিষ্কার ও দার্শনিকদের প্রচেষ্টা, শিক্ষকদের অক্লান্ত মেধাশ্রম ও শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম এবং সেনাদের বীরত্ব সকল কিছুই ঐ একটি লক্ষ্যকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ ক্রুসেডারদের উত্থানের জন্যই ছিল।

তাই তো উত্তাল সমুদ্রের বিপদসংকুল ও অমানুষিক শ্রমসাপেক্ষ অভিযানেও কলোম্বাসের উদ্দেশ্য ছিল এই সমুদ্রযাত্রা থেকে যা কিছু অর্জন হবে তা 'বদদীন' মুসলিমদের কাছ থেকে 'পবিত্রভূমি' মুক্ত করার কাজে ব্যবহার করা হবে। চার্লস অষ্টম যখন আলপ্স ও নেপলসের মধ্যকার যুদ্ধের উত্তাল ময়দানে যুদ্ধ করেন তখন তার মনেও ছিল, সে ইতালি বিজয় করে তুর্কিদের কাছ থেকে কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে।

সামনে পর্তুগালের বিজয়ী সেনাদের চিঠিপত্র এবং কূটনীতিকদের লেখালেখি যখন উদ্ধৃত করা হবে তখন এই বাস্তব সত্যটি আরো সুস্পষ্ট হবে।

একথা একাধিক বার বলা হয়েছে, পর্তুগিজরা ভাস্কো দা গামা'র নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় পূর্ব আফ্রিকা হয়ে রাস উমেদ[২৩] অতিক্রম করে ভারতীয়

---

[২৩] গুড হোপ বা উত্তমাশা, দক্ষিণ আফ্রিকার একটি অন্তরীপ।

উপকূলে পা রাখে। ভারত, চীন, সিয়াম,[২৪] জাভা, সুমাত্রা, ভারতীয় দ্বিপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, মালাবর, মোম্বাসা, জানযিবার, হাবশা, (ইথিওপিয়া) মিসর, আরব ইত্যাদি অঞ্চলের সকল সামুদ্রিক বাণিজ্য যা ভারত সাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, আরব সাগর দিয়ে চলাচল করতো তার সবগুলোর নিয়ন্ত্রণ আরবদের হাতে ছিল। তারাই ছিল পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে একমাত্র ব্যবসায়ী। হিন্দুস্তান, ইরান, চীন থেকে মাল নিয়ে মিসর পৌঁছতো। সেখান থেকে ভেনিস ও জেনেভার ব্যবসায়ীরা ইউরোপে নিয়ে যেতো এবং সেখান থেকে ইউরোপের মাল নিয়ে হিন্দুস্তান, ইরান, চীন ইত্যাদি প্রাচ্যের অঞ্চলগুলোতে নিয়ে যেতো। এই ব্যবসা ও বাণিজ্যিক রাস্তায় যেসব মুসলিম দেশের অবস্থান ছিল সেসব মুসলিমদের– বিশেষত আরবদের– ব্যবসা ও সম্পদের প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়। পর্তুগাল ভারত সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথেই চেষ্টা করতে থাকে যেভাবেই সম্ভব হয় আরবদের কাছ থেকে এই বাণিজ্য ছিনিয়ে নিতে হবে। ইসলামি দেশ হয়ে যে রাস্তাটি চলে গেছে তার বদলে নিজেদের আবিষ্কৃত নতুন রাস্তা ব্যবহার করতে হবে।

পর্তুগিজদের অরাজকতার সূচনা

পর্তুগিজরা তাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আরবদের জাহাজে হামলা শুরু করে। আফ্রিকা হিন্দুস্তান এবং পারস্যের উপকূলীয় অঞ্চলে হামলা শুরু করে। অমুসলিমদেরকে বাধ্য করে তারা যেনো মুসলিমদের কাছে পণ্য বিক্রি না করে। মালাবারের মোপলা অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের উপর চরম অত্যাচার করা হয়। ইয়ামান ও হিজাজের উপকূলীয় শহরগুলোকে দখল করে নেয়। হিন্দুস্তানে সিন্ধ থেকে শুরু করে মাদরাজ (অধুনা চেন্নাই) গুজরাট, মোম্বাই বন্দরগুলোকে দখল করে নেয়। দ্বীপগুলোতে এবং উপকূলের মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালায় মসজিদ ভেঙ্গে ভেঙ্গে গির্জা বানানো হচ্ছিলো। কালিকুটের রাজাকে বাধ্য করা হয় সে যেনো মুসলিদেরকে আরবে যাতায়াত করতে বাধা দেয়। ভারতের উপকূলীয় অঞ্চল কোচিন দখল করে সেখানকার মুসলিমদের হত্যা করা হয় এবং

---

[২৪] থাইল্যান্ডের পুরাতন নাম সিয়াম। ২৩ জুন ১৯৩৯ সালে নাম সিয়াম পাল্টে থাইল্যান্ড রাখা হয়। বক্ষমাণ বইটি রচনাকালে এর নাম সিয়াম ছিল। তাই লেখক সিয়াম নামটি ব্যবহার করেছেন।

মসজিদ ভেঙ্গে গির্জা বানানো হয়। ধীরে ধীরে আরব ও হিন্দুস্তানের অনেক উপকূলীয় অঞ্চল তারা পদানত করে। ৯১৫ হিজরিতে কালিকুটে হামলা করে তারা লুণ্ঠন চালায়। সেখানকার মসজিদ জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। একই অরাজকতা ও লুণ্ঠন তারা আরবের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতেও করে। সামুদ্রিক পথে হজগমনকারীরা কদাচিৎ এই লুণ্ঠনবাজদের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারতো। গোয়ার প্রসিদ্ধ বন্দর বিজয়পুর সালতানাতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। গুজরাট অঞ্চলের সকল বন্দরের লুণ্ঠন ও লুটতরাজ করে। জেদ্দা ও এডেন বন্দরে একাধিকবার হামলা চালায়। এ হামলা কখনো সফল হয়। কখনো হয় অসফল। পরিশেষে পর্তুগিজরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, তারা জিদ্দা দখল করে হিজাজের উপর হামলা চালাবে। আল্লাহ মাফ করুক! মক্কা ও মদিনা শহরকে ধ্বংস করে হারামাইনকে নিশ্চিহ্ন করে ইসলামের ইমারাতের প্রতিটি ইটকে নির্মূল করা হবে।

পর্তুগিজদের প্রতিহিংসা

আরবি ও ফার্সি ভাষায় রচিত ইতিহাসে এসব ঘটনা সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ বিদ্যমান, তা ইয়ামান গুজরাট ও মালাবারের অতীত ইতিহাসের সাধারণ পুস্তকেও বর্ণিত হয়েছে। তবে আমরা এখানে খৃস্টান ঐতিহাসিকদের বক্তব্যকে নকল করা অধিক যথার্থ মনে করছি,

> ১৫০২ হিজরি সনে পর্তুগালের বাদশাহ ম্যানুয়েল নিজের জন্য একটি দীর্ঘ উপাধি নির্বাচন করেন– হিন্দুস্তান, আরব, ইথিওপিয়া, ইরানের বাণিজ্য ও জাহাজপথের মালিক। ম্যানুয়েল ষড়যন্ত্র আঁটলেন, হিন্দুস্তান ও আরবের মাঝ দিয়ে চলমান মুসলিমদের বাণিজ্যকে এডেন হরমুজ এবং মালাকা দখল করে বরবাদ করে দেওয়া হবে। এই বন্দরগুলো দিয়ে প্রাচ্যের বাণিজ্যিক মালপত্র আলেকজান্দ্রিয়া ও বাইরুত হয়ে ইউরোপ পৌঁছতো। মালাকা এমন একটি স্থান ছিল, যেখানে মুসলিম ও আরবরা চীনের সাথে পণ্যবিনিময় করতো।...যেহেতু পর্তুগিজদের উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও ইউরোপের বাণিজ্যকে গুডহোপ অন্তরীপ থেকে স্থানান্তরিত করা এবং যে রাস্তাটি কায়রো ও ইস্কান্দারিয়ার উপর দিয়ে গেছে সে রাস্তাকে নষ্ট করে দেওয়া, এজন্য হিন্দুস্তানের

মুসলিম ব্যাবসায়ী মোপলারা মিসরের মামলুক সুলতানকে কৌশলে ক্ষেপিয়ে তুললো।[২৫]

এই উদ্দেশ্যে সে ৮৪৮ হিজরিতে জেদ্দা হামলা করে। আল্লামা কুতবি 'ইলাম' নামক গ্রন্থে এবং মুফতি ওয়াহলান 'ফুতুহাতে' এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন।

> পর্তুগাল ইউরোপিয়ানদের জ্ঞাতি ভাই। যাদের সম্পর্কে আমরা আগেই বলেছি, তারা ছিল সমুদ্রের ত্রাস;জলদস্যু। এরা অনেক ইসলামি অঞ্চলের উপর হামলা করেছিল। তাদের দেহ -মন-প্রাণ সবকিছুই তাদেরকে এ কাজ করতে প্রবুদ্ধ করেছে। তারা চেয়েছিল, হারামাইন ও আরব দ্বীপ দখল করে নিতে। ৯৩৮ হিজরির শেষে ইউরোপিয়ানদের বিশাল একটি বাহিনী ইসলামি বন্দরগুলোতে প্রবেশ করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সেখান থেকে তারা জেদ্দার উদ্দেশে রওনা হয়। আবুদ দাওয়াইর পোতাশ্রয়ে তারা নোঙর ফেললো। সেনা ও যোদ্ধাস্ত্রে ৮৫ টি জাহাজ ভর্তি ছিলো।

সারা দুনিয়ার মানুষকে খৃস্টান বানাতে হবে!

যারা কেবল ইউরোপীয় লেখক ও ঐতিহাসিকদের কথাকে সত্য মনে করেন কিংবা নির্ভরসাযোগ্য মনে করেন তাদের জন্য আমরা এখানে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ১৯২১ সালের জার্নালের উদ্ধৃতি দেবো। যেখানে মিস্টার মানসেল লংওয়ার্থ দামিস (১৮৫০-১৯২২) এর একটি নিবন্ধ 'ভারত সাগরে তুর্কি ও পর্তুগিজ' নামে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে তিনি বেশির ভাগ ঘটনা পর্তুগিজ রেফারেন্সে লিখেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক তাদের এই অপরাধ ও আনাচারকে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

> পর্তুগিজ ভাইসরয় এলবুকিয়ারিক ১৫১৩ খৃস্টাব্দে একটি দুঃসাহসী কাজ করেন। সে এডেন কেল্লায় সিড়ি ব্যবহার করে ঢোকার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেননি। তারপর জিদ্দায় ফিরে আসেন। সে সারা দুনিয়াকে খৃস্টান বানানো এবং

---

[২৫]হিস্টোরি অব ইন্ডিয়া, এম পরুথেরু এম. এ., (১৯১৫)

ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহ দখল করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার বড় একটি স্বপ্ন লালন করতো। অবশেষে লোহিত সাগরের আবহাওয়া তাদের সহনীয় না হওয়ায় জেদ্দা পৌঁছতে পারেনি। তার লোকেরা কামরানে জ্বরের শিকার হয়ে পড়ে।

ইসলামি ইতিহাসে লিখিত আছে পর্তুগিজরা জেদ্দায় হামলা করেছে এবং পরাজয় বরণ করেছে। যেভাবেই হোক তাদের পরাজয় সংঘটিত হয়েছে। চাই সে পরাজয় মানুষের তরবারির আঘাতে হোক; কিংবা অদৃশ্য শক্তির হস্তক্ষেপে হোক।

হাজার মাইল দূর থেকে হিন্দুস্তানের মুসলিমদের সহায়তায় উসমানিগণ

পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে পাঠকের সামনে ইথিওপিয়া সাগর, ভারত সাগর, আরব সাগর ও পারস্যের উপসাগরে এবং চীন সাগরে ইসলামি দ্বীপসমূহ ও উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে ধ্বংসযজ্ঞ এবং আরব ও মুসলিম বাণিজ্যগুলো ধ্বংস করার একটি মর্মান্তিক চিত্র ফুটে উঠে থাকবে। হয়তোবা কারো হৃদয় প্রচণ্ডভাবে দ্রবীভূত হয়েও থাকবে। পাশাপাশি ইসলামি দেশসমূহ ও ইউরোপের লড়াইয়ের দরুন অর্থনীতিক ও রাজনীতিক চিত্র পরিবর্তনে এইসব ঘটনার ভূমিকা কতোটা প্রবল তাও অনুধাবন করতে পারবে। সেসময় ভারত সাগরে রাজত্ব ছিল আগ্রার 'জালালুদ্দীনি ওয়াদ দুনিয়া আকবর জিল্লুল্লাহ'। আর অন্যদিকে কনস্টান্টিনোপলের মসনদে ছিল সুলতান সুলাইমান। ইসলামের এই করুণ চিত্র তাদের দুজনের সামনেই ছিল। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এদের দুজনের মধ্য থেকে কার অন্তর ইসলামদরদী ছিল? কে ইসলামকে এই মসিবত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে কুরবানি করেছে? কে নিজের সেনা ও সম্পদ সাগরে ডুবানোর দুঃসাহস করেছে? এই কঠিন ও বিপদসংকুল মুহূর্তে তৈমুরের বংশধররা[২৬] নিজেদের দায়িত্ব কি পালন করেছে? নাকি যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হাজার মাইল দূরে ছিলো সে এই দায়িত্ব পালন করেছে? খেলাফতের মহা দায়িত্ব যার কাঁধে সমর্পিত ছিল সে এই কাজ সমাধা করেছে। আর আকবরের অসহায় দশা তো এমন ছিল,

---

[২৬] মোগল সম্রাটগণ ছিলেন তৈমুর লংয়ের বংশধর।

ইউরোপীয়রা মুসলিমদের উপর ব্যাপক হত্যা ও লুণ্ঠন চালায়। জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ আকবরের কতিপয় জাহাজ মক্কায় ইউরোপের অনুমতি ছাড়া আসা-যাওয়া করতো। জিদ্দা বন্দর থেকে ফেরার সময় হত্যা-লুণ্ঠন করে মুসলিমদেরকে চরমভাবে তারা অপমানিত করে। যেদিন আকবরের জাহাজ ইউরোপিয়ানদের হাতে বাজেয়াপ্ত হয় সেদিন থেকে আরব ও আজমের জাহাজ যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেলো। কারণ ইউরোপিয়ানদের থেকে অনুমতি নেওয়ার বিষয়টি নিতান্তই লজ্জাজনক ও অপমানজনক ব্যাপার। আবার তাদের অনুমতি উপেক্ষা করে জাহাজ রওনা করলে মানুষের প্রাণনাশ ও টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের ভয় আছে। তবে আকবরের সভার আমির মির্জা আব্দুর রহিম খানেখানাঁ ও আরো কয়েকজন আমিররা ইউরোপীয়দের অনুমতিক্রমে জাহাজ রওনা করেন। [২৭]

পর্তুগিজদের নৈরাজ্যের প্রথম জবাব

যাই হোক, এই হামলার মোকাবিলায় মুসলিমরা যেসব সংগ্রাম করেছে তার মধ্যে সর্বপ্রথম হলো, আব্বাসি খেলাফতের প্রতিনিধি, যিনি মিসর, শাম ও আরবের শাসক ছিলেন তিনি বিজয়পুর গুজরাট ও অন্যান্য ইসলামি দেশকে সাথে নিয়ে পর্তুগিজদের উপর ৯১৩ হিজরি সনে ভারত উপকূলে অসফল হামলা করেন।

তারিখে ফিরিশতায় মিসরের সুলতানের জাহাজের বদলে ভুলবশত রোমের সুলতানের জাহাজ বলা হয়।

> খবর পৌঁছল, এই বছর (১৫১৩) ইউরোপিয়ানরা উপকূলে হামলা করার ইচ্ছা করেছে। যার ফলে দুর্গগুলো অবরুদ্ধ হয়ে যাবে । এদের শত্রু রোমের সুলতান এই খবর শুনে

---

[২৭] তারিখে ফিরিশ্তা, ২য় খণ্ড ৩৭৩ পৃষ্ঠা। মূল ফার্সি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। লেখক এখানে মূল ফার্সি পাণ্ডুলিপির উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

> অনেকগুলো জাহাজ তাদের প্রতিরোধ ও লড়াইয়ের জন্য উপকূলে প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে কিছু জাহাজ গুজরাটের তীরবর্তী অঞ্চলে পৌঁছে যায়।[২৮]

তারপর যুদ্ধ ও লড়াইয়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর সত্যতা শুধু এতোটুকুই, মিসরীয় নৌবহরের অধিকাংশ অফিসার ও নাবিক তুর্কি ছিলো। এজন্য মিরআয়ে সিকান্দারি (গুজরাটের ইতিহাস) বইয়ে এই ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

> যেহেতু ইউরোপিয়ানদের অরাজকতার দরুন বাসিন ও মাহাইমের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ালো। যখন আদইন অঞ্চলে পৌঁছল খবর আসলো সুলতানের গোলাম ও দিউ শহরের শাসক মালিক আয়াজ রোমে নির্মিত দুটি জাহাজ নিজের সাথে নিয়ে জিবোল বন্দরে পৌঁছে ইউরোপিয়ানদের সাথে তুমুল লড়াই শুরু করে।[২৯]

কিন্তু সঠিক কথা হলো ১৫১৩ হিজরি সনে জঙ্গি জাহাজ পাঠিয়েছিলেন মিসরের সুলতান ঘুরি। যেমনটা রিয়াজুস সালাতিন (বাংলার ইতিহাস) গ্রন্থে বলা হয়েছে,

> অতএব সুলতান কানুস ঘোরি আমির হুসাইনকে সরদার বানিয়ে ১৩ মনজিলের একটি জাহাজ– যা মানুষ ও যোদ্ধাস্ত্র বোঝাই ছিলো– ভারতীয় উপকূলের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। সুলতান মাহমুদ গুজরাটি ও সুলতান মাহমুদ দক্কানিও দেব বন্দর, কোলা বন্দর,ওয়াবিল বন্দর ও জিবোল বন্দর থেকে ইউরোপিয়ানদের সাথে যুদ্ধের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে জোর প্রস্তুতির সাথে জাহাজ রওনা করেন।

হিন্দুস্তানে তখনো তাইমুরি বংশধরদের শাসন শুরু হয়নি। তুর্কিরাও তখন হারামাইনের খাদেম হননি। ৯২৩ হিজরিতে সুলতান সালিম মিসর, শাম, আরবের শাসনভার নিজ হাতে নেন। এর কয়েক বছর পরে হিন্দুস্তানের দিগন্তে তাইমুরি বংশের সৌভাগ্যের সেতারার উদয় হয়। ৯২৬ থেকে নিয়ে ৯৭৪ সাল পর্যন্ত সুলতান সুলাইমান বিন আজম বিন সুলতান সালিমের

---

[২৮] তারিখে ফিরিশ্‌তা, ২য় খণ্ড ২০৪ পৃষ্ঠা। মূল ফার্সি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
[২৯] মিরআয়ে সিকান্দারি, ২১৬ পৃষ্ঠা।মূল ফার্সি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

শাসনকাল। এই সময়পর্বে হিন্দুস্তানে বড় বড় বিদ্রোহের একাধিক উত্থান-পতন হয়েছে। ৯৩২ হিজরিতে লোদিদেরকে হটিয়ে বাবর হিন্দুস্তানের শাসনে আসলেন। ৯৩৭ সালে হুমায়ুন সিংহাসনে বসলেন। ৯৪৭ হি. সালে শের শাহ হুমায়ুন থেকে দিল্লির মসনদ ছিনিয়ে নিলেন। ৯৬২ হিজরি সালে হুমায়ুন পুনর্বার দিল্লির তাজ মাথায় পরিধান করেন। ৯৬৪ হি. সালে আকবর হিন্দুস্তানের সিংহাসনে আসীন হন। মুসলমান

পর্তুগিজদের দস্যুতা থেকে পরিত্রাণের জন্য গুজরাটের দূত উসমানি দরবারে

এ সময়গুলোতে পর্তুগিজদের সামুদ্রিক অন্যায় ও দস্যুতা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অসংখ্যবার মুসলমান ও ইসলামি দেশগুলোকে করুণ অবস্থার সম্মুখীনহতে হয়েছে। সে সময়ে গুজরাটের ইসলামি সালতানাতের সামুদ্রিক শক্তি সবচেয়ে মজবুত ছিলো। তথাপি তারাও পর্তুগিজদের জাহাজের আক্রমণের দরুন নিরুপায় ও অসহায় হয়ে পড়ে। অসহায় গুজরাটকে উসমানি খেলাফতের দরবারে আরজি জানাতে হয়।

হিস্টোরি অব দা ওয়ার্ল্ডে বলা হয়, সুলাইমান

> গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের দরবার থেকে এক দূত পর্তুগিজদের মোকাবিলায় সহযোগিতা প্রার্থনার জন্য কনস্টান্টিনোপলের দরবারে হাজির হয়। পর্তুগিজরা কিছু দিন পূর্বে বাহাদুর শাহের কাছ থেকে দেব বন্দর ছিনিয়ে নিয়েছিলো। ১৫৬৪ খৃস্টাব্দে হিন্দুস্তানের বাদশাহ আলাউদ্দিনের পক্ষ থেকে এক দূত এসে কনস্টান্টিনোপলে আগমন করে পর্তুগিজদের হামলা প্রতিরোধে সহযোগিতার জন্য।[৩০]

---

[৩০] হিস্টোরিয়ান্স হিস্টোরি অব দা ওয়ার্ল্ড ২৪ তম খণ্ড ২৪৬ পৃষ্ঠা, তুর্কি ও পর্তুগিজদের যুদ্ধের ইতিহাসের চারটি নির্ভরযোগ্য উৎস আছে। হিজাজ ও ইয়ামানের অতীত ইতিহাসের বইসমূহ। যেমন, আল ইলাম বিবাইতিল্লাহিল হারাম, আল বারকুল ইয়ামানি ফিল ফাতহিল উসমানি, রাওহুর রুহ ফি মা বাদাল মিআতিত তাসিআতি মিনাল ফুতুহ এবং গুজরাটের একটি আরবি ইতিহাসগ্রন্থ তারিখু মজাফফর ওয়া আলিহি। ফারসি ইতিহাসের মধ্যে ফিরিশতা, তুহফাতুল মুজাহিদিন, রিয়াজুস সালিহিন মিরআতে সিকান্দারি; তুর্কিতে মিরআতুল মামালিক এবং হাজি খলিফার তারিখ। চতুর্থ উৎস, পর্তুগিজ বিভিন্ন ডকুমেন্টস যাতে বহু এমন বিষয় রয়েছে যা অন্য উৎসে

পর্তুগিজদের হাত থেকে আরবদের বাঁচাতে উসমানিগণ

১৫১৫-১৫১৬ খৃস্টাব্দে পর্তুগিজরা এডেনে হামলা করে। আরব গোত্রপতিরা এসব হামলা রোধ করতে পারেনি এবং অস্ত্র সমর্পণ করে। এখান থেকে ফিরে পর্তুগিজরা জিদ্দায় হামলা করে। এখানকার রইস সুলাইমান মিসরের সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নর ছিলেন। সে পর্তুগিজদের প্রতিরোধ করে। পর্তুগিজরা এখান থেকে ফিরে আবার আক্রমণের ইচ্ছা করেছিল। তবে কামরানে এসে তাদের মত পাল্টে ফেলে। পুনরায় তারা এডেনে ফিরে এল। ইত্যবসরে আরবরা তাদের ভগ্নপ্রায় দুর্গগুলো পুনর্নির্মাণ করে নিয়েছিল । তারপর পর্তুগিজরা জিদ্দার কাছে আসা মাত্রই বুঝতে পারে এখন মিসর ও লোহিত সাগরের কর্তৃত্ব মামলুক বংশের দুর্বল হাত থেকে কনস্টান্টিনোপলের মজবুত ও দৃঢ় হাতে চলে গেছে। এ খবর তাদের উপর বজ্রপাতের মতো আপতিত হল। তুর্কিদের নাম শুনেই পর্তুগিজরা কেঁপে উঠতে লাগল। জিদ্দার গভর্নর রইস সুলাইমান যথাযথ সময়ে সুলতান সালিমের আনুগত্য করার ঘোষণা দিয়ে দেন। সুলতান চাইলেন তখনই মিসরের নৌবহর পর্তুগিজদের মোকাবিলার জন্য পাঠাবেন। কিন্তু চিন্তাভাবনা করে দেখা গেল এতে খুব বেশি কাজ হবে না। তিনি হুকুম জারি করলেন সুয়েজে লোহিত সাগরের নৌঘাঁটিতে শীঘ্রই একটি নৌবহর পাঠানো হোক। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হওয়ার আগেই সুলতান ১৫১৯ সালে ইন্তেকাল করেন।

সুলতান সুলাইমানের ইন্তিকালের পর কয়েক বছর পর্যন্ত এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোনো কর্মসূচী দৃষ্টিগোচর হয় নি। কেননা রইস সুলাইমান ও জিদ্দার গভর্নর আফসার হায়দার নামের একজন লোকের সাথে বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় । পর্তুগিজরা জিদ্দা থেকে গিয়ে ১৫১৭ খৃস্টাব্দে ইথিওপিয়ান উপকূলের আরব জনবসতির উপর হামলা করে।

যাইলাকে (সুমালি ল্যান্ডকে) ধ্বংস করে দিল। পরের বছর বারবারা দখল করে নিল। এসব অঞ্চলের আরব মুসলিম ও ইথিওপিয়ান খৃস্টানদের মধ্যে মতদ্বন্দ্ব ছিল। পর্তুগিজরা ইথিওপিয়ান খৃস্টানদের পক্ষাবলম্বন করতো এবং

পাওয়া সম্ভব না। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল, লন্ডন, জানুয়ারি সংখ্যায় এক প্রবন্ধকার এই যুদ্ধেতিহাসের সকল পর্তুগিজ তথ্য সংকলন করেছেন। একই বছর ডিসেম্বর সংখ্যায় অন্য আরেক গবেষক আরবি ফার্সি তুর্কি তথ্যের একটি সংকলন করেন। আগ্রহী পাঠকগণ আরো বেশি তথ্যের জন্য এসব উৎস পড়তে পারেন।

তুর্কিরা আরবদের আশ্রয় দিত। আরবদের প্রবল ধারণা ও বিশ্বাস ছিল পর্তুগিজরা তুর্কি নৌবহরের মোকাবিলা করতে পারবে না। এজন্য পর্তুগিজদের নিজেদের সামুদ্রিক সুনাম বজায় রাখার জন্য কিছু না কিছু করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। ১৫২৩ খৃস্টাব্দে একটি পর্তুগিজ নৌবহর লোহিত সাগর থেকে ইথিওপিয়ান উপকূল মাসাওয়াতে (ইরিট্রিয়ায়) এজন্য পাঠানো হয়েছে যে, তারা যেনো ইথিওপিয়ার দরবারে পর্তুগালের প্রেরিত দূতকে ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু তারা তা করতে পারেনি। ১৫২৪ খৃস্টাব্দে তারা আবার এডেন অভিমুখী হল। আরবের গোত্রপতিকে আনুগত্য মেনে নিতে বলপ্রয়োগ করা হয়। কিন্তু তা ফলপ্রসু হয় না।

পরের বছর রইস সুলাইমানের নেতৃত্বে একটি তুর্কি নৌবহর এডেন অবরোধ করে। তবে পর্তুগিজদের সাথে পেরে উঠতে পারেন নি। তুর্কি নৌ সেনাপতি এতো সহজে দমবার পাত্র নন। সে লাগাতার পর্তুগিজদের উপর ভারত সাগরে হামলা চালাতে থাকে। এক পর্যায়ে সে গুজরাটের উপকূলে চলে আসে। সেখানে তাদের মধ্যেও পর্তুগিজদের মধ্যে একাধিক সংঘর্ষ হয়। তারপর সুলতান সুলাইমান সুয়েজের তীরে ৬৬ টি জাহাজের একটি নৌবহর তৈরি করে। যার মধ্য ২৫ টি বড় বড় জাহাজ ছিল। এবং ছোট ছোট মালবাহী নৌযান ছিল। সবগুলোকে দৃঢ় ও শক্তিশালী যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। তুর্কি ঐতিহাসিক হাজি খলিফার বর্ণনা মতে, এই ত্রিশ হাজার সেনাদের মধ্যে সাত হাজার নিগচারি (তুর্কি দক্ষ সেনাদের একটি দলের নাম) যোদ্ধা ছিল। এদেরকে হিন্দুস্তানের উপকূলের দিকে রওনা করা হয়। সকল জাহাজ ও সরঞ্জামাদি মিসরের শাসক সুলাইমান পাশার তত্ত্বাবধানে ছিল এক পর্তুগিজ নৌচালক হাজরামাউতের নিকটে শিহর নামক স্থানে ফেঁসে যায়। সে তার নৌবহরকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

পর্তুগিজদের পিছু ধাওয়া করে ভারত সাগরে নিয়ে আসল

মুসলিমদের এই অভিযান শুরু হওয়ার আগেই পর্তুগিজ বন্দি পালিয়ে পর্তুগাল চলে যায়। সেখানে গিয়ে তুর্কিদের সামুদ্রিক পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয়। কিন্তু ততক্ষণে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। হিন্দুস্তানের পর্তুগিজ সেনাদের কাছে কোনো সহযোগিতা পৌঁছানো অসম্ভ হয়ে পড়েছিল। গুজরাটের সেনাবাহিনীতে অনেক তুর্কি সেনার অন্তর্ভুক্তি হয়।

তারা তুর্কি সেনাপ্রশিক্ষণ মোতাবেক গুজরাটের সেনাদের প্রশিক্ষণ দেয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম সেনাদের একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে। ১৫৩৬ সালের জুন মাসে এই সেনাবাহিনী স্থলপথে দেব বন্দরের উপর হামলা করে। দিনদিন সমুদ্রপথে তুর্কি নৌ বাহিনীর আগমনের খবর গোয়া আসতে লাগল।

পরিশেষে বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতির পর দেব থেকে নিজেদের তোপখানাকে বাঁচাতে সক্ষম হল। আগস্ট মাসের শেষে তুর্কি সেনাদের একটি অগ্রগামী দল ম্যাংগ্রোল এসে পৌঁছে। সেখানে একটি পর্তুগিজ জাহাজ ওঁত পেতে ছিলো। শীঘ্রই তারা গোয়ায় খবর পাঠিয়ে দিলো। দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদ্রের আবহাওয়া পরিবর্তন তাদের মনোবল দুর্বল করে দেয়। সাগরে যে হালকা বাতাস প্রবাহিত ছিল তা তুর্কিদের বিশালাকার জাহাজের জন্য মোটেই অনুকূল ছিলো না। পর্তুগিজরা ভারত সাগরের আবহাওয়া সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলো। তাই তাদের জাহাজ ছোট ও হালকা ছিলো। পক্ষান্তরে তুর্কিদের ভূমধ্যসাগরের সামুদ্রিক অভিজ্ঞতা ছিলো। তাই তুর্কিদের জাহাজ ভূমধ্যসাগরের আবহাওয়ার উপযোগী করে ক্ষুদ্র জাহাজের বদলে বিশাল বিশাল জাহাজ তৈরি করতো।

সুলাইমান পাশা ২২ জুন ১৫৩৭ সালে সুয়েজ থেকে বের হন। জিদ্দায় কিছু দিন অবস্থান করার পর এডেনে আসেন। এখানে ৩ থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত অবস্থান করেন। গাজি বিন দাউদ নামে একজন গোত্রপতির কাছ থেকে সুলাইমান পাশা এডেন বন্দরটি ধোঁকাবাজি করে ছিনিয়ে নেন। আধুনিক রাজনীতিক পরিভাষায় যাকে ডিপ্লোম্যাসি বা কূটনীতি বলে বাহবা দেওয়া হয়। তারপর সুলাইমান পাশা এখানে অল্প কিছু সৈন্য রেখে বাকিদের নিয়ে গুজরাটের উপকূলাঞ্চলের দিকে ধাবিত হন। ১৫৩৮ সালে দেব বন্দরে হাজির হন এবং গুজরাটিদের সাথে মিলে পর্তুগিজদের উপর হামলা করেন।

ইত্যবসরে সাগরের আবহাওয়ার দরুন তুর্কিদের ভেতর নতুন চাঞ্চল্য ও তৎপরতা সৃষ্টি হয়। জাহাজ একটি নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসার প্রয়োজন দেখা দেয়। তারা জাহাজ দেব বন্দর থেকে বিশ মাইল দূরে মুজাফফরাবাদে এসে থামালেন। এই স্থানান্তরকরণ ও জায়গা পরিবর্তনের সময় আবহাওয়ার প্রতিকূলতার দরুন চারটি জাহাজ ভেঙ্গে যায়। তিন সপ্তাহ পর জাহাজগুলো চলার উপযোগী হওয়ায় তাদেরকে দেব বন্দরে নিয়ে আসা

হয়। পর্তুগিজদের সামুদ্রিক বন্দর ভালোভাবে অবরোধ করা হয় এবং এমন তোপ ব্যবহার করা হয় যার দ্বারা ৯০-১০০ পাউন্ডের গোলা নিক্ষেপ করা যায়। গোলাবর্ষণ ৫ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত তীব্রভাবে অব্যাহত ছিল। এর মধ্যে পর্তুগিজদের কিছু সহযোগিতাও চলে আসে। তবুও তারা পর্তুগিজদের উপযুক্ত মোকাবিলা করার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়নি। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, যুদ্ধের এই বিক্ষুব্ধ ময়দান থেকে হঠাৎ এক সকালে তুর্কিরা তাদের জাহাজের নোঙর উঠিয়ে রওনা শুরু করে দেয়। পর্তুগিজরা নিশ্চিত পরাজয় থেকে বেঁচে গেল।

ঐতিহাসিকগণ এই আকস্মিক ঘটনার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। তুর্কি ঐতিহাসিক হাজি খলিফা, হিন্দুস্তানের ঐতিহাসিকদের মধ্যে'তুহফাতুল মুজাহিদিন' এর লেখক, 'মিরআতে আহমাদি' এর লেখক, 'রিয়াজুস সালাতিন' এর লেখক এবং আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে'জাফরু আল ওয়ালিহ' এর লেখক প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এই বর্ণনা করেন যে, গুজরাটিরা রসদ ও খাবারদাবার প্রেরণ করা বন্ধ করে দেয়।

বন্ধ করার কারণ কী? যেমনটা 'জাফরু আলওয়ালিহ' এর লেখক বলেছেন, পাশা খুবই আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ও নিজের মতামতকেই বরাবর কার্যকর করতো এবং তার অহমিসা, উন্নাসিকতা ও অবিচারের দরুন গুজরাটের শাসকরা ব্যথিত হন। তুর্কি ও গুজরাটি মুসলিমদের একতা ভেঙ্গে যাওয়ার দরুন তাদের নিশ্চিত জয়টি পরাজয়ে পর্যবসিত হয়। সুলতান সুলাইমান যখন এসব শুনলেন অনেক কষ্ট পেলেন। সুলাইমান পাশাকে দরবারে ডেকে অপমান করা হয়। সুলতান রাগান্বিত হয়ে বলেন,

> আমি আপনাকে দেব থেকে পর্তুগিজদের বের করার জন্য পাঠিয়েছিলাম; সেখানকার শাসকদের সহযোগিতা করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। আপনাকে আমি তাদের উপর কর্তত্ব ও প্রভুত্ব করার জন্য পাঠাইনি।

১৫৪৫ খৃস্টাব্দে পর্তুগিজরা দেবে পুনর্বার আক্রমণ করে। কার্যতভাবে যদিও এতে তুর্কিরা শরিক ছিলো না; তবে এই হামলার পূর্ণ নকশা তুর্কিদের তৈরি করা ছিল। তুর্কিদের ঐ অসফলতার দরুন ইউরোপীয়দের উৎসাহ বেড়ে যায়। তারা এডেনে গিয়ে পুনর্বার তা দখল করে নেয়। হাজারামাউতের দ্বিতীয় বন্দরটিও তাদের প্রভাব ও দখলের আওতায় চলে আসে। সে সময় ইথিওপিয়ায় মুসলিম ও খৃস্টানদের মধ্যে রাজনীতিক যুদ্ধ চলছিলো।

ইথিওপিয়ার প্রাচীন খৃস্টান রাজ্য ও ইথিওপিয়ান উপকূলের মুসলিম আরবদের মধ্যেযুদ্ধ চলছিলো। তুর্কিরা এই যুদ্ধের জন্য নিজেদের তোপচিদের প্রেরণ করে; যারা আরব গোত্রদের মধ্যে লড়াই-যুদ্ধের পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলো। পর্তুগিজরা চূড়ান্ত দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে ইথিওপিয়ানদের সহযোগিতার জন্য লোহিত সাগরে নিজেদের নৌবহর রওনা করে। ১৫৫১ সালে সুলতান বিখ্যাত তুর্কি নৌসেনাপতি পিরি বে'র তত্ত্বাবধানে একটি শক্তিশালী নৌবহর সুয়েজ থেকে ভারত সাগরের উদ্দেশ্য রওনা করেন। এই নৌবহর আরব উপকূলের এডেন, জাফার, শাম্মার প্রভৃতি উপকূল সাফ করে মাস্কাট এসে পৌঁছে। সেখানে তারা পর্তুগিজ নৌবাহিনীর অসতর্কতার সুযোগে খুব সহজেই তাদেরকে বাগে নিয়ে আসে। সামনে অগ্রসর হয়ে পারস্য উপসাগরের তীর থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করে হরমুজ প্রণালিতে এসে পৌঁছে। সেখানে দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। পর্তুগিজদের কাছে প্রচুর সামুদ্রিক সহযোগিতা পৌঁছে। যার ফলে তারা তুর্কি নৌবহরকে বিক্ষিপ্ত করে দিতে সক্ষম হয়। পিরি বে বহুকষ্টে দুটি জাহাজ নিয়ে ভারত সাগর থেকে লোহিত সাগরে এসে প্রবেশ করে। কিন্তু জাহাজের বিশাল একটি সংখ্যা পারস্য উপসাগরে বন্দি হয়ে যায়।

মুরাদ বে নামক আরেকজন অফিসারকে সুলতান স্থল পথে বাসরা যাওয়ার আদেশ দিলেন। বললেন, সেখান থেকে পারস্য উপসাগরে বন্দি নৌবহরকে উদ্ধার করে লোহিত সাগরে নিয়ে আসতে। মুরাদ বে নিতান্তই দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে হরমুজের সামনে এসে হাজির হলেন। পর্তুগিজ বাহিনী তার নেশানার আওতার ভেতরে চলে আসে। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। দুজন তুর্কি অফিসার সুলাইমান রেইস (ক্যাপ্টেন) এবং রজব রেইস মারা যান। অনেক জাহাজ ডুবে যায়। অন্যরা পালিয়ে বসরার উপকূলে আশ্রয় নেয়। সুলতান পরিশেষে তার বিখ্যাত নৌসেনাপতি সাইয়্যিদি আলি রেইসকে পাঠান। তিনি ইতিপূর্বে বারবারুসার অধীনে কাজ করেছেন। সুলতান তার উপর একটি গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। তাকে বাকি ১৫ টি জাহাজ লোহিত সাগরে নিয়ে আসতে বলেন।

সাইয়্যিদি আলি রেইসের সফরনামায় তুর্কি-পর্তুগিজ যুদ্ধ

সাইয়্যিদি আলি তার নিজ সফরনামায় এবিষয়ে লেখেছেন। তার তরজমাও বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে। ইংরেজি থেকে এটার বিকৃত ও ত্রূটিপূর্ণ

অনুবাদও উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সাইয়্যিদি আলি তার এই সফরনামায় দুর্বহ স্মৃতিগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন।

৯৬১ হিজরি সালের ১ তারিখে সাইয়্যিদি আলি নৌবহর নিয়ে পারস্য উপসাগরের তীর ধরে জাহাজ চালিয়ে বুশেহেরে পৌঁছে। সেখান থেকে কাতিফে যায়। তারপর যখন রাসমুসান্দামে এসে পৌঁছলো তখন পর্তুগিজ নৌবহরকে অপেক্ষমাণ দেখতে পেলো। একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পর্তুগিজদের পরাজয় হয়।

সাইয়্যিদি আলি তার সম্মুখপথ নির্বিঘ্ন করে নিলো। খোলা সমুদ্রে এসে সে মাস্কাটের সামনে উপনীত হলো। সেখানে পর্তুগিজদের আধিপত্য ছিলো। যেখানে তাদের জাহাজ এসে মেরামত হয়েছে এবং সেখানে পূর্ব থেকে কিছু জাহাজ মজুদ ছিল। তারা সামনে থেকে এসে তুর্কিদের ঘিরে ধরে। দ্বিতীয়বার দু'পক্ষ মুখোমুখি হয়। তুমুল লড়াইয়ে উভয় পক্ষের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। রাতের অন্ধকার তাদের মধ্যে অন্তরাল হয়ে দেখা দিলো। তারা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে গেলো। ইত্যবসরে আবহাওয়া এতোটা বিগড়ে যায় এবং বাতাস এতোটাই তীব্র হয়ে যায় যে, সাইয়্যিদি আলির পক্ষে তীর ধরে চলে অসম্ভব হয়ে পড়ে। গভীর সমুদ্রে গিয়ে রাতের অন্ধকারে পথ হারিয়ে আরব উপকূলের বদলে বেলুচিস্তানের উপকূলে এসে উপনীত হয়। কয়েক দিন দিগ্বিদিক ঘুরে সে পুনরায় লোহিত সাগরের পথ ধরে। কিন্তু অকস্মাৎ তুফান এতোটাই প্রবল হয়ে উঠে যে সে আবার ভারত সাগরে চলে আসে। গুজরাটের উপকূল দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। দামানের বন্দরও দেখা যাচ্ছিলো। কিন্তু এখান থেকে দ্রুত বের হয়ে সুরাতে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলো। সাইয়্যিদি আলি ক্লান্ত হয়ে এখানেই জাহাজ ত্যাগ করে স্থলপথে যাত্রা শুরু করলো। সেসময় আগ্রায় হুমায়ুনের রাজত্ব ছিলো। তার সাথে মোলাকাত করে আফগানিস্তান ও ইরান হয়ে ইরাকে প্রবেশ করলো। এই অভিযানের এখানেই পরিসমাপ্তি হয়।

পর্তুগিজদের পতনে উসমানিগণ

ইথিওপিয়া আরব ও ভারতের ইসলামি রাজত্বগুলো হেফাজত ও সংরক্ষণের পথে এটাই ছিলো সুলতান সুলাইমানের শেষ প্রচেষ্টা। এরপর যদিও পর্তুগিজদের সাথে মামুলি বিবাদ হতো, তবে বড় কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। সুলতান তৃতীয় মুরাদের সময় (৯৮২-১০০৩ হিজরি) এই উদ্দেশ্যে

নতুন তৎপরতার সূচনা হয়। পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইয়ামানের শাসক হাসান পাশা ৯৯৩ হিজরি সনে পর্তুগিজদের মোকাবিলার জন্য আলি বেগের নেতৃত্বে নৌবহর প্রস্তুত করলেন। আলি বেগ ১৮৮০[৩১] (১৫৮০) সালে মাস্কাটের উপর একটি সফল আক্রমণ চালান। পর্তুগালের শক্তি তখন ক্রমশ দুর্বল হচ্ছিলো। সমুদ্রে ডাচ ও ইংলিশদের জাহাজের আনাগোনা শুরু হলো।

১৫৮৪ ইসায়ি সনে ইয়ামানের শাসক বাবুল মানদিব দিয়ে বের করে দুটি জাহাজ পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে পাঠান। যেনো লোহিত সাগরের নৌবহরের জন্য আফ্রিকা থেকে কাঠ সংগ্রহ করা যায়। আলি বেগ এই জাহাজগুলো নিয়ে আফ্রিকার উপকূলে পৌঁছলো এবং সবখানে খবর রটিয়ে দিলো তুর্কিরা বিশাল বড় এক নৌবহর পর্তুগিজদের ওসব স্থান থেকে বের করার জন্য সামনে অগ্রসর হচ্ছে। পর্তুগিজদের দুর্বলতা এই প্রচারণার পালে শক্ত হাওয়া জোগালো। উপকূল ও দ্বীপাঞ্চলের আরবরা প্রকাশ্যে তুর্কিদের সহযোগিতার ঘোষণা দিলো। মোগাডিসো, ব্রাদা, লামু দ্বীপ এবং মোম্বাসা তুর্কি কর্তৃত্ব মেনে নেয়। লামেন্দি ছাড়া এই অঞ্চলে আর কোনো দেশই পর্তুগিজদের হাতে থাকলো না।

পর্তুগিজরা একটি নৌবহর লোহিত সাগরে পাঠালো। কিন্তু এরা এতোটাই দুর্বল ছিল যে, আলি বেগের ফেরার পথে ঐ জাহাজগুলোকেও তারা ধরতে পারে নিযাতে কেবল উপঢৌকন, মালামাল এবং গনিমতের মাল হিসেবে একটি পর্তুগিজ জাহাজ ছিল। ৯৯৩ হিজরি সনের রজব মাসে এই মালবোঝাই জাহাজ ইয়ামানের উপকূলে নোঙর ফেলে। ১৫৮৯ খৃস্টাব্দে ইয়ামানের শাসক খুব আনন্দের সাথে আলি বেগকে স্বাগত জানায়।

---

[৩১] অনুলিপিকার ভুলবশত ১৮৮০ সাল লিখেছেন– অনুবাদক।

রুশ অঞ্চলে মুসলিমদের দুঃসহ ইতিহাস ও উসমানিগণ

এক হারানো মুসলিম সালতানাতের কথা

আন্দলুসের পর ইউরোপের মাটিতে দ্বিতীয় সর্বপ্রথম ইসলামি সালতানাত ছিল বুলগার। এটাকে দানিয়ুব নদীর পাশে অবস্থিত বুলগেরিয়ার সাথে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। বুলগারের অবস্থান ইউরোপিয়ান রাশিয়ার ওরাল পর্বতমালা ও ভলগার মধ্যবর্তী অঞ্চলে। কোনো এক সময় এটা সম্পূর্ণ ইউরোপিয়ান রাশিয়া জুড়ে বিস্তৃত ছিল। তার পূর্বে ছিল ওরাল পর্বতমালা ও জায়েক (য়ায়েক) নদী। যেটাকে এখন ওরাল নদী বলা হয়। এর পশ্চিমে রয়েছে আদফা ও ভলগা নদীর সঙ্গমস্থল। বুলগারের বাদশাহ তার সহজাত মনোবৃত্তিচালিত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করেন। সেসময় বাগদাদে খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ সিংসাহনে ছিলেন। বুলগারের বাদশাহ খলিফার নিকট দূত পাঠিয়ে তার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন এবং দারুল খেলাফত থেকে আলেম-উলামা ও জ্ঞানীগুণীদের একটি দল পাঠানোর অনুরোধ করেন। খলিফা আলেম ও জ্ঞানীগুণীদের একটি দল বুলগারে পাঠান। সেই দলে আহমদ ইবনে ফাজলান নামে একজন লেখক ছিলেন। তিনি একটি অনবদ্য সফরনামা লিখেছিলেন। যার কিছু অংশ এখনো পাওয়া যায়।

দলটি ৩১০ হিজরি সালে বাগদাদ থেকে বুলগার রওনা হয়। বাদশাহ মুসলমান হওয়ার দরুন দরবারের জ্ঞানীগুণীজন ও অধিকাংশ সাধারণ নাগরকিও মুসলমান হয়ে যায়। সেই সময় থেকে শুরু করে ৮৩৮ হিজরি পর্যন্ত ইতিহাসে এই সালতানাতের কোনো-না-কোনোভাবে নাম-নিশানার হদিস পাওয়া যায়। এরপরে রুশদের অমানবিকতার কালো অন্ধকারে ঢেকে যায় এই সালতানাতের ইতিহাস। বুলগার শহর, একসময় যা রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল; ইসলামের আলোয় উজ্জীবিত ছিল, আজ তা নিষ্প্রাণ কবরস্থানে পরিণত হয়েছে।

এটা প্রথম তাতারি বা তুরানি ইসলামি সালতানাত ছিলো; যা রুশ নরপিশাচদের হাতে ৮৩৮ হিজরি মোতাবেক ১৪৩০ খৃস্টাব্দে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এটা খেলাফতে উসমানিয়ার ৮৫ বছর আগের ঘটনা। এরপরে ঐ অঞ্চলের অন্যান্য ইসলামি দেশের পালা আসে।

রুশরা সুলতান সুলাইমানের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়ে আস্ত্রাখানের খানকে নিষেধ করার এবং তার কাজ থেকে তাকে বিরত রাখার অনুরোধ করলেন। সুলতান তাদের এই অনুরোধ গ্রহণ করলেন। খান সুলতানের এরূপ কাণ্ড দেখে বুঝতে পারলেন, রুশদের কারণে এতদঞ্চলের মুসলিমদের যে ভয়াবহ পরিণতি বরণ করতে হয়েছে সেবিষয়ে সুলতান অবগত নন। খান প্রতিনিধি পাঠিয়ে রুশদের সার্বিক অবস্থা সুলতানকে জানালেন। কিন্তু এক রুশ মুসলিম ঐতিহাসিক লেখেন, রুশরা সুলতানের দরবারের উপদেষ্টা ও আমিরদের মোটা অংকের ঘুষ দেন, তারা যেনো খানের পাঠানো তথ্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। আর এজন্যই খানের পাঠানো প্রতিনিধিকে হতাশ হয়ে সেখান থেকে ফিরতে হয়।[৩২]

সুলতান সুলাইমানের নিকট প্রকৃত সত্য বেশিদিন গোপন থাকেনি। রাশিয়ার ইসলামি সালতানাতগুলো কোনো বিবেচনাতেই সুলতান সুলাইমানের অধীনে ছিলো না; তবে এসব রাষ্ট্রের সাথে সুলতানের সম্পর্কটা শুধু হারামাইনের সেবক ও দীনের হেফাজতকারী হিসেবে। সেখানকার বাসিন্দারা তাই সুলতানের প্রতি একপ্রকার অলিখিত আনুগত্যে আবদ্ধ ছিল।

সুলতানের চিঠিতে তিন দেশ একসাথে রুশদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়

আস্ত্রাখান এলাকাটি ক্রিমিয়া ও নোওগাইয়ের মাঝখানে ছিল বিধায় তারা সবসময় ভীত থাকতো। এজন্য তারা চাইল এই দুটোর বিরুদ্ধে রুশদের সাথে মিলে আঁতাত করবে এবং রুশদের অধীনতা মেনে নিবে। এসব যখন ঘটছিলো ঠিক তখনই সুলতান সুলাইমান প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন। তিনি আস্ত্রাখানের খানকে একটি ফরমান পাঠিয়ে নিরস্ত করলেন।[৩৩] এবং সাথে ক্রিমিয়ার দৌলত কারায়ে খান ও নোওগাইয়ের মির্জা ইউসুফকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসা এবং সহমর্মিতা ও সহযোগিতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে চিঠি লেখেন। এই চিঠির প্রভাব এতোটাই ব্যাপক হল যে, তারা তিন জন মিলে রুশদের মোকাবিলা করার সংকল্প করলো।

রুশ বার্তাবাহককে আস্ত্রাখানে গ্রেফতার করা হয়। রুশদের তাদের উপর হামলা করার জন্য এই একটি অজুহাতই যথেষ্ট ছিলো। দুর্ভাগ্যক্রমে সেসময় রুশ দরবারে এক নোওগাই সরদার মির্জা ইসমাইল মওজুদ

---

[৩২]তালফিকুল আখবার, ২য় খণ্ড ৮৬,৮৭
[৩৩]প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৮

ছিলো। সে রুশ বাদশাহকে হামলার জন্য আরো বেশি উস্কানি দিতে লাগলো এবং তাকে বললো, আস্ত্রাখানের আসল উত্তরাধিকারী দরবেশ খান। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী খোদ মির্জা ইসমাইল নিজে রুশ সেনাদের নিয়ে আসেন।

আস্ত্রাখানের করুণ পরণতি

আস্ত্রাখানের রাজধানী সারাই তখন একদম খালি ছিল। খান তখন অন্য জায়গায় ছিলেন। এই সুযোগে রুশরা নিতান্তই নির্দয়ভাবে আস্ত্রাখানের অধিবাসীদের হত্যা করে। রাজধানী দখল করে আনুগত্যের চুক্তি নিয়ে এবং খারাজ প্রদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দরবেশ খানকে সিংহাসনে বসান। ইয়ামকুরচি খান তার কয়েকজন সঙ্গীদের নিয়ে শহরত্যাগ করেন।

দরবেশ খান সিংহাসনে বসে ক্রিমিয়ার খানের সাথে সম্পর্ক আরো জোরদার করে একতাবদ্ধ হন। উপরন্তু তার পরে ক্রিমিয়ার খানের ছেলেকে তার উত্তরাধিকার নির্বাচন করেন। রুশরা এই একতাবদ্ধতাকে বরাবরই ঘৃণা করে আসছিল। তাই ৯২৫ হিজরি মোতাবেক ১৭৫৭ সালে দরবেশ খানের উপর হামলা করে আস্ত্রাখান দখল করে নেন। আর ঐ অঞ্চলের ইসলামি সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ও বড় বড় আলেমদের জন্মমৃত্যুর সাক্ষী সারাই শহরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। মুসলিমদের হত্যা করা হয়। ভবনগুলোকে ধুলিস্যাৎ করা হয়। মসজিদগুলোকে গির্জায় পরিণত করা হয়।

সুলতান দ্বিতীয় সালিম

৯৭৪ মোতাবেক ১৫৬৬ সালে সুলতান দ্বিতীয় সালিম সিংহাসনে বসেন। তিনি এসে আস্ত্রাখান পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করলেন। তিনি সেনা পাঠালেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের যেসব মুসলিম পূর্বে এই শহর অবরোধ করেছিলেন তাদের একত্রিত করলেন; । যেহেতু যুদ্ধক্ষেত্র সালতানাতের কেন্দ্র থেকে দূরে ছিলো তাই ক্রিমিয়ার খান চিঠি লিখে সাহায্য প্রেরণ করার জন্য বললেন। ক্রিমিয়ার খান হয়তো চায়নি, তার আস্ত্রাখানের শত্রু একবার মৃত্যুর পর পুনরায় আবার জীবিত হোক, তাই সে সাহায্য পাঠায় নি। কিংবা হয়তো সে এই ভয়ে সাহায্য করেনি যে, এখানে যদি তারা সফল হয় তাহলে উসমানি সুলতানের ক্ষমতা বেড়ে যাবার দরুন সে নিজ অঞ্চলে সুলতানের অধীনস্থ হয়ে থাকবেন।

ক্রিমিয়ার মুসলিমদের বিভ্রান্ত করতে জাল ফতোয়া ও মুসলিমদের পরাজয়

ক্রিমিয়ার খানের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাই হোক, সে তার মৌলভিদের দিয়ে একটি ফতোয়া লেখালেন। ফতোয়াতে বলা হয়,

> আস্ত্রাখান যেহেতু এমন অঞ্চল যেখানে গ্রীষ্মকালে গরম কেবল চার ঘণ্টার হয় মাগরিবের দুই ঘণ্টার পর ইশার নামাজ পড়তে হবে এবং এর পর মাত্র দুঘণ্টা নিদ্রার সুযোগ, তার পরেই আবার উঠে ফজরের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, যা খুবই কঠিন ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আবার কেউ যদি আরাম ও স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখতে চায় তাহলে আল্লাহর কাছে নামাজ ত্যাগী সাব্যস্ত হবে। সেজন্য এমন দেশে মুসলমানদের অবস্থান করা জায়েজ নেই।

এই ফতোয়ার প্রভাবে ক্রিমিয়ার মুসলিমদের কাছ থেকে সুলতানের সেনাদের কাঙ্খিত সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। তাছাড়া মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডা, বরফপাত ও রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার দরুন সকল সেনা দলছুট ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যার ফলে রুশরা খুব সহজে মুসলিমদের পরাজিত করে।

এটা ছিল ইতিহাসে তুর্কি-রুশ যুদ্ধের দীর্ঘ ধারাবাহিকতার প্রথম সূচনা । এই যুদ্ধে তুর্কিরা অন্য ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য নিজেদের জানবাজি রাখে।[৩৪]

রুশদের কবলে কাজান রাজ্য

আস্ত্রাখানের পর কাজানের পালা এলো। কাজানের মুসলিমরা প্রকৃতঅর্থে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি বুঝেছে। রুশদের একাধিকবার তারা পরাজিত করেছে। একবার তো তারা রাজধানীর দেয়ালের তলদেশ থেকে রুশদের ধাওয়া করে বিদেয় করেছে। ৯৩১ হিজরি মোতাবেক ১৫২৩ সালে কাজানিরা সুলতান সুলাইমানকে নিজেদের দুরবস্থা সম্পর্কে অবগত করায়। এছাড়া কোনো উত্তম উপায়ও তাদের ছিল না। তারা চিঠি পাঠাল, আমরা মুসলমান আর আপনি মুসলমানদের বাদশাহ। আপনি আমাদেরকে জালিম থেকে বাঁচান।

সুলতান সুলাইমান সম্মত হলেন। এবং তার নির্ধারিত প্রতিনিধি মাস্কোর মাধ্যমে ইওয়ানকে (রুশ সম্প্রদায়ের বাদশার উপাধি) লেখে পাঠান, সে যেনো কাজানের দিকে চোখ তুলে না তাকায়। জনশ্রুতি আছে, প্রতিনিধিকে

---

[৩৪] হিস্টোরিয়ান্স হিস্টোরি অব দা ওয়ার্ল্ড তুর্কি খণ্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা

ঘুষ দিয়ে ইওয়ান উসমানি সুলতানকে পাল্টা জবাব দিয়ে বললেন, কাজান বহু আগেই রুশ রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে গেছে। এখন কাজানে খানদের কোনো হুকুম চলবে না।[৩৫] এর পরপরই রুশরা দ্রুত কাজানের উপর হামলা করে বসল। কাজানের অনেক অমাত্য রুশদের সাথে একাত্ম হয়েছে। তাদের মধ্য প্রসিদ্ধ শাইখ আলি কাজানি ছিল।

শাইখ আলি কাজানি রুশ সেনাবাহিনীর প্রধান নির্ধারিত হন। সে সেনাবাহিনীকে কাজানের দুর্গের নিচে নিয়ে আসেন। সে সময় কাজানের মসনদে ৯৩১ হিজরি মোতাবেক ১৫২৪ খৃস্টাব্দে সাহিব কারাই খান ছিলেন। তিনি সাহস হারিয়ে ফেলেন। হতাশ হয়ে পড়েন। কাজানের দুর্গ থেকে বের হয়ে যান এবং বলেন, আমি সুলতানের কাছে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে সেনা সংগ্রহ করে রুশদের উপর হামলা করবো। কাজানিরা তার স্থানে সাফাই কারাই খানকে তার জায়গায় বসায়। কেল্লাবন্দি হওয়া সত্ত্বেও বীরবিক্রমে প্রবলভাবে তারা আক্রমণ চালায়। শত্রুদের কচুকাটা করে।

রুশরা এরপর আরো দুবার কাজানে হামলা করে। আর অন্যদিকে কেফা'র পাশাদের ঘুষ দিতে থাকে। এরা সুলতান সুলাইমানের নিযুক্ত প্রশাসক ছিল। যাতে করে তারা এখানকার খবরাখবর কিছুতেই সুলতানের কাছে না পৌঁছায়।[৩৬]দুর্ভাগ্যক্রমে, ৮৫৬ হিজরি মোতাবেক ১৫৪৯ খৃস্টাব্দে কাজানের বাদশাহ সাফাই কারাই খানের ইন্তেকাল ঘটে। বিধবা সিওন বেগম ও দুই বছরের শিশু পেশ কারাই খানকে রেখে যান। লোকেরা ঐ ছোট্ট ছেলেকে সিংহাসনে বসাল এবং ক্রিমিয়ার খান সাহেব কারাই খানকে চিঠি লিখল, সে

যেনো তার ছেলেকে এখানকার খান বানিয়ে পাঠায়।

দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা যেনো ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছিলো, সাহিব কারাই খান তার ছেলের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। তাই সে তার ছেলেকে না পাঠিয়ে কনস্টান্টিনোপলে সুলতানের কাছে চিঠি লিখলেন, তিনি যেনো দৌলত কারাই খানকে কাজান পাঠিয়ে দেন। সুলতানের দরবারে সাহিব কারাই খানের বিরোধীদের দল খুব মজবুত ছিল। তারা সুলতানের মাথায় ঢুকিয়ে দিলো যে, নিশ্চয় এতে সাহিব কারাই খানের কোনো কুমতলব ও দুরভিসন্ধি আছে। সুলতান এদের কথাকে আমলে নিলেন এবং সাহিব

---

[৩৫]তালফিক ২/ ৯১

[৩৬] তালফিক ২/১৩

কারাই খানকে বরখাস্ত করে দৌলত কারাই খানকে ক্রিমিয়ার খান নির্বাচন করেন।[৩৭]

দৌলত কারাই খান মসনদে বসেই রাশিয়াকে হুমকি দিয়ে বলল, কাজানের দিকে চোখ তুলে না তাকাতে। সুলতান সুলাইমান অমাত্য ও খানদের চিঠি লিখলেন, বিশেষত কাজানের অল্পবয়সী খানের নানা মির্জা ইউসুফ নোওগাইকে চিঠি লিখে বললেন, আপনারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান।

> তিনি তাদেরকে ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত হতে বলেন এবং কাজানকে রুশদের হাত থেকে মুক্ত করার আদেশ দেন।

আরও বলেন, চেঙ্গিজ খানের কোনো বংশধরকে সর্বসম্মতিতে কাজানের খান নির্বাচন করুন। তবে যেহেতু তাদের সাথে খেলাফাতে উসমানির বদলে রুশদের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ভালো ছিল এবং রুশরা যেহেতু তাদের খুব কাছেই থাকতো তাই তারা দুনিয়ার উপর দীনকে অগ্রাধিকার দিতে সক্ষম হয়নি।

সুলতান সুলাইমান মির্জা ইউসুফ নোওগাইকে বন্ধু মনে করতেন এবং নিতান্তই আন্তরিকতা থেকে আমিরুল উমারা বলে সম্বোধন করতেন। তিনি একক সফরে মস্কো গমন করেন এবং রুশদের সন্ধি ও আপোশের মাধ্যমে কার্য সমাধা করতে চাইলেন। কিন্তু এতেও তিনি সফল হলেন না। রুশ ইওয়ান কাজানি বিশ্বাসঘাতক অমাত্যদের ফৌজসমেত কাজানে পাঠালেন এবং তিনি নিজেও একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে রওনা হন। রুশরা শহরকে অবরোধ করল। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। কাজানিরা বীরবিক্রমে লড়াই করল। নোওগাইয়ের সরদার ইয়াদগার মুহাম্মাদ খান পাঁচশো অশ্বারোহী নিয়ে কাজানকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো। ক্রিমিয়া এবং উসামানি তুর্কিরা রুশদের মনোযোগ নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে অন্যদিক থেকে হামলা করে। তদুপরি তাদের পরাজয় বরণ করতে হয়।[৩৮] ৯৫৯ হিজরি মোতাবেক ১৫৫২ খৃস্টাব্দে এক বিশাল ইসলামি বাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

---

[৩৭]প্রাগুক্ত ১২৬

[৩৮]প্রাগুক্ত ১২৮, ১২৯, ১৩০

রুশদের মোকাবিলায় কাওজাক বা কাজাকিস্তানের মুসলিমদের পাশে উসামনিগণ

কাওজাক, যাকে আমরা কাজাক বলি এবং ইউরোপিয়ানরা কাসাক বলে। এটি রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের ডানে ও ইউক্রেনের মাঝে অবস্থিত। এরা প্রথমে মরুচারী ও যাযাবর ছিল। এরা সকলেই মুসলিম। বংশপরম্পরায় এরা আনাস বিন মালিক রা. এর বংশধর বলে দাবি করেন। প্রকৃতঅর্থে এরা বিভিন্ন তুরানি বংশের একটি শংকর জাতি। তুর্কি শব্দ 'কাওজাকে'র অর্থ ফেরারি বা যাযাবরবৃত্তি। যেহেতু তারা সভ্য ও সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রকে এড়িয়ে চলে তাই তারা সালতানাতের কেন্দ্র থেকে পালিয়ে দূরে চলে যেতো এবং লুঠতরাজ করতো। এজন্য তাদেরকে কাওজাক বলা হতো। পরবর্তীতে এটাই তাদের নামপরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপের যখন জাগরণ হচ্ছিলো তখন এক দিক থেকে রাশিয়া ও অন্যদিক পোল্যান্ড তাদেরকে দমন-পীড়ন চালাতে লাগলো । তারা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। তবে পেরে উঠতে পারে না। তারা বিভক্ত হয়ে রুশ ও পোল্যান্ডে প্রবেশ করে।

কাওজাকরা নতুন দেশে তাদের নতুন অধিপতিদের হাতে চরম নিপীড়নের শিকার হয়। পরিশেষে ১০৮৩ হিজরি মোতাবেক ১৬৭২ সালে তারা তাদের ঐ আশ্রয়স্থলে ফিরে আসলো যা শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিমদের নিরাপদ আশ্রয় ও ইসলামের কেন্দ্র ছিলো । মুহাম্মাদ ফরিদ বে 'তারিখে দাওলাতে উসমানিয়া'য় এই বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেন,

> ঐ সময়ে সালতানাতে উসমানিয়ার ব্যাপক প্রসার এই কারণে বেড়ে যায় যে, কাওজাক যারা রাশিয়ার দক্ষিণে বসবাস করতো, তারা মহান খলিফা চতুর্থ মুহাম্মাদের বশ্যতা স্বেচ্ছায় মেনে নেয়। তাদেরকে যুদ্ধ-লড়াই করে অনুগত বানানো হয়নি। বরং তারা নিজ ইচ্ছা ও আগ্রহে ইসলামের সেবকের ছায়াতলে থাকাকে গ্রহণ করে নিয়েছে।[৩৯]

কাওজাকদের খান কনস্টান্টিনোপল আগমন করলো। সুলতান তাকে সুনাম ও পদ প্রদান করেন তাকে ইউক্রেন প্রদেশের সানজাক বে ঠিক করেন। সাথে সাথে ক্রিমিয়ার খানকে আদেশ করলেন, তারা যেনো দুশমনদের মোকাবিলায় কাওজাকদের সহায়তা করে।

---

[৩৯] প্রাগুক্ত ১৩৫

সাম্রাজ্যবাদী পোল্যান্ডকে আহমদ কোপরিলির ঐতিহাসিক জবাব

অবস্থা বেগতিক দেখে পোল্যান্ড একটি অভিযোগনামা কনস্টান্টিনোপলে পাঠায়। খেলাফতে উসমানিয়ার ইতিহাসে অনন্য এক মন্ত্রী আহমদ কোপরিলি এই অভিযোগের জবাব প্রদান করেন,

> স্বাধীন কাওজাকরা পোলিশদের (পোল্যান্ডবাসী) অধীনতা মেনে নিয়েছিলো একসময়। কিন্তু তারা যখন দেখল পোলিশদের অত্যাচার আর সহ্য করা যাচ্ছে না, তারা তখন এদিক-সেদিক আশ্রয় খুঁজতে লাগল। এখন তারা উসমানি পতাকাতলে চলে এসেছে এবং তারা আনুগত্য মেনে নিয়েছে। যদি নিপীড়িত দেশের মানুষ অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য কোনো বড় শাহেনশাহর সাহায্যপ্রার্থী হয় তাহলে এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে তাদের নিরাপদ ঠিকানা ও আশ্রয়স্থল পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা? যখন বর্তমান সময়ের সবচে ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী সুলতান তাদেরকে তাদের শত্রুদের থেকে রক্ষা করছে এবং অত্যাচারিতদের সাহায্য করছে, তো এই পরিস্থিতিতে কার বিরুদ্ধে সন্ধি ভঙ্গ করার অভিযোগ উঠবে? যদি পারস্পরিক বিরোধের আগুন নেভানোর জন্য সন্ধি ও সম্প্রীতির ইচ্ছাপোষণ করা হয় তাহলে তা অব্যাহত থাকতে দিন। আর যদি এই বিরোধিতার মীমাংসার জন্য ঐ ধারালো তীক্ষ্ণ ও মীমাংসাকারী বিচারকের কাছে অর্পণ করা হয় যার নাম তলোয়ার তার ফলাফল ঐ স্রষ্টাই বলবেন যিনি আসমান ও জমিনকে নিরবলম্বভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন এবং যিনি ইসলামকে এক হাজার বছর যাবত তার দুশমনের বিরুদ্ধে বিজয় দান করে আসছেন।[৪০]

পোলিশরাও সেই ধারালো ও মীমাংসাকারী বিচারকের ফয়সালার উপর আমল করা যথোপযুক্ত মনে করল যার নাম তলোয়ার। তারা ইউক্রেন ও ক্রিমিয়ার উপর হামলার প্রস্তুতি নিতে লাগল। তুর্কিরা ৬ হাজার সৈন্য বহু আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। পরে সুলতান চতুর্থ মুহাম্মাদ নিজেই সৈন্যসহ রওনা হলেন। তলোয়ার নামক বিচারক অবশেষে সিদ্ধান্ত দিল, পোলিশরা ইউক্রেন ও পোডোলিয়া এই দুই প্রদেশ থেকে নিরস্ত থাকবে এবং প্রতি বছর ২২ লাখ টাকা বার্ষিক খারাজ আদায় করবে। কিন্তু পোলিশ খুব দ্রুতই

---

[৪০] হিস্টোরিয়ান্স হিস্টোরি অব দা ওর্য়াল্ড, তুর্কি খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৮

এই প্রতিশ্রুতি পালনে বিমুখ হয়ে গেল। যার ফলে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পোল্যান্ড রুশ এবং এতদঞ্চলের খৃস্টান অমাত্যদের তাদের সহযোগী হিসেবে পেয়ে গেল ।

যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের পাল্লা একেক সময় একেক দিকে ভারী হতে লাগল। পরিশেষে ১৬৭৬ সালে পূর্বেকার সেই ফায়সালাই বহাল রইল, যা 'বিচারক অসী' যুদ্ধের ময়দানের আদালতে নির্ধারণ করেছিল। ইউক্রেন নিয়মমাফিক সুলতানের অধীনেই রয়ে গেল। এরপর যুদ্ধের ময়দান রুশরা এককভাবে উত্তপ্ত রাখে এবং বহু বছরের যুদ্ধের পর সেই ফায়সালাই বহাল থাকল যে, কাওকাজ আগের মতো সুলতানের অধীনেই থাকবে।

অবশেষে কাজাকদের প্রলোভন দেখিয়ে রাশিয়ায় শামিল করা হল

সালতানাতে উসমানিয়া যখন দুর্বল হয়ে এলো তখন রুশরা কাজাকদেরকে তরবারির ভয়ের বদলে টাকা-পয়সা ও সহায়-সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসে। তাদেরকে তারা প্রচুর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। পরবর্তীতে এরাই রুশদের সবচে চৌকস সেনা হয়ে দাঁড়ায়। সারা দুনিয়ায় কাওজাকদের সম্পর্কে এক আতঙ্ক ও বিশেষ সমীহভাব সৃষ্টি হয়।

ইউরোপিয়ান ও রুশ ঐতিহাসিকদের একটি মিথ্যাচার ও তার উদ্দেশ্য

আশ্চর্যের কথা হল, খোদ রুশ গবেষকগণ এবং ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ যারা সত্যানুসন্ধান ও নির্মোহ গবেষণার দাবি করেন তারা এই কাওজাকদের সম্পর্কে একটি মত খুব প্রসিদ্ধ করে আসছেন যে, কাওজাকরা খৃস্টান ছিলো। আল্লাহ মালুম, কোন যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে তারা এমন কথা প্রচার করলেন। বর্তমান সময়ের এক রুশ মুসলিম ঐতিহাসিক এবিষয়ে হতবাক হয়ে লেখেন– "কাওজাকদের একজনও অমুসলিম ছিলো না। যদিও রুশ মিসনারিরা তাদেরকে খৃস্টান হিসেবে প্রসিদ্ধ করার জন্য আজও শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন।"

সম্ভবত তারা এজন্য এদেরকে খৃস্টান প্রমাণে উদ্যত হয়েছেন যে, তারা চান খৃস্টান দুনিয়ার বিশাল এই বাহিনী মুসলিম সেনাদের রক্ত ও শ্রমের বিনিময়ে এতোটা শক্তিশালী হয়েছে, এটা যেনো দুনিয়ার তাবৎ মানুষ জানতে না পারে।

ক্রিমিয়ার খানের গাদ্দারি

এখন এই অঞ্চলে সর্বসাকুল্যে কেবল একটি মুসলিম সালতানাত বাকি রইল। ক্রিমিয়ার খানদের সালতানাত। তারাও ১৮৫৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত লড়ে গেছে। যদিও মাঝে মাঝে তাদের পরাজয়ের গ্লানিও সইতে হয়েছে। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে উসমান পাশা দাগিস্তানের উপর হামলা করে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তাদের বিজয় অর্জন হয়। সুলতানের হুকুম সত্ত্বেও উসমান পাশার সহযোগিতার জন্য ক্রিমিয়া সেনা পাঠায়নি, ক্রিমিয়ার কপালে এই কলঙ্ক তিলক রয়ে যাবে যে, তারা সুলতানের আদশ সত্ত্বেও উসমান পাশার সহযোগিতার জন্য স্বীয় বাহিনী পাঠায়নি। কিন্তু এই বীর সেনানায়ক দাগিস্তান থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে পুরো কোকেশাস অতিক্রম করে এবং তার সামনে বাধাসৃষ্টিকারী রুশ বাহিনীকে পরাজিত করে কৃষ্ণসাগরের অপর তীর পর্যন্ত চলে আসে। সরাসরি ক্রিমিয়ার মুখোমুখি তার সৈন্য দাঁড় করিয়ে দেন। ক্রিমিয়ার খানও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। ইসলামের সাথে ক্রিমিয়ার খানের এই নিষ্ঠুর গাদ্দারির বদলাটা তারই এক ধর্মীয় ভাই আদায় করলো। উসমানের সামনে খান অসহায় হয়ে পরাজয় বরণ করল।

রুশরা ১৭৬৯ সালে ক্রিমিয়ার উপর হামলা করে। এই যুদ্ধ কয়েক বছর যাবত চলে। এক পর্যায়ে এই যুদ্ধের আগুন চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকার প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। রুশদের সামুদ্রিক শক্তি খুবই মজবুত ছিল। তারা কৃষ্ণসাগরের বন্দর তরাবজুন ও ক্রিমিয়ার উপর হামলা চালায়। গ্রিসের দ্বীপগুলো দখল করে নেয়। ভূমধ্যসাগরে এসে মিসরের বিদ্রোহী গভর্নর আলি পাশাকে তারা সহযোগিতা করে। বৈরুতের উপর গোলাবর্ষণ করে। কনস্টান্টিনোপলে হামলা চালায়। তবে ক্রিমিয়া ছাড়া অন্য কোথাও তারা বেশি দিন টিকতে পারেনি। বাধ্য হয়ে সরে যেতে হয়েছে ।

রুশ ও উসমানিদের চুক্তি

১৭৭৩ সালে প্রথম সন্ধিচুক্তি বৈঠকে রুশরা এই আবেদন করে যে, ক্রিমিয়ার তাতারিদের সাথে উসমানি খেলাফতের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। উসমানি সাম্রাজ্যে যতো অর্থোডক্স খৃস্টান আছে তাদেরকে রুশদের কাছে দিয়ে দিতে হবে। রুশদের রাষ্ট্রপ্রধানকে ভবিষ্যতে বাদশাহ বলে সম্বোধন করতে হবে। সুলতান এই শর্তগুলো গ্রহণ করলেন না । অবশেষে ১৭৭৪ সালে উভয় পক্ষই এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তারা একমত হন, ক্রিমিয়া, সার্বিয়া, কাওবান রাজনীতিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত থাকবে। তবে ধর্মীয়ভাবে তারা সুলতানের অনুগত থাকবে এবং ঐ সকল স্থান ও কেল্লা যা রুশরা

দখল করে নিয়েছে তা ক্রিমিয়ার খানের কাছে অর্পণ করতে হবে। রুশদের আস্তানা পিরা'তে তারা নিজেদের গির্জা বানাতে পারবে এবং সকল অর্থোডক্সদেরকে রুশদের ধর্মীয় প্রভাবের আওতায় ধরা হবে। রুশ রাষ্ট্রনায়ককে বাদশাহ লেখা হবে। রুশ দ্বীপসমূহ ও গারজিস্তান প্রভৃতি শহরকে তুর্কিদের হাতে তুলে দিতে হবে।

ক্রিমিয়ার পতনের শেষপর্ব এবং রুশদের জোরদখলের ইতিহাস সম্ভবত হিন্দুস্তানি লোকদের মনে আছে। কারণ, ঐ যুদ্ধে আমাদের হিন্দুস্তানের "ইসলামপ্রিয় সরকার"ও ক্রিমিয়ার মুসলিমদের প্রতি সহমর্মী হয়ে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সেনা পাঠিয়েছিলেন। যে 'অনুগ্রহে'র দুর্বহ বোঝা থেকে এক মহা যুদ্ধের পরও মুসলিমরা নির্ভার হতে পারেনি।

ক্রিমিয়ার মুসলিম সালতানাতের পতনের ইতিহাস

ক্রিমিয়ার পতনের ঘটনা হল, সুলতান সুলাইমানের সময়কাল থেকেই বাইতুল মুকাদ্দাসের খৃস্টীয় পবিত্র স্থানসমূহ ও গির্জাসমূহের দখল ও নিয়ন্ত্রণ ছিল ফ্রান্সের হাতে। ফ্রা ক্যাথলিক ও রুশরা অর্থোডক্স। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেবাইতুল মুকাদ্দাসের কর্তৃত্ব নিয়ে বিবাদ ও অতিশয়তা ছিল। রুশরা তাদের অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের তরফদারি করত। তুর্কিরা এবিষয়ে মীমাংসা করার জন্য বিভিন্ন খৃস্টান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করে। কমিশন একাধিক বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বাইতুল মুকাদ্দাসের পবিত্র স্থানসমূহের কর্তৃত্ব ফ্রান্সের হাতেই বহাল থাকবে। রুশরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। তারা ঘোষণা করে, যদি বাইতুল মুকাদ্দাসের কর্তৃত্ব ফ্রান্সের হাতে থাকে তাহলে তারা তলোয়ারের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করবে। তুর্কিরাও তাদের সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসেনি। এক বিশাল যুদ্ধের শুরু হল। তুর্কিদের লাখ লাখ সেনা মারা যায় এবং কয়েকটি প্রদেশ তাদের হাত থেকে ছুটে যায়। এই যুদ্ধই ইতিহাসে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে বিখ্যাত। এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড রুশদের মোকাবিলায় তুর্কিদের সহযোগী ছিল। আর এটাই সেই 'মহা অনুগ্রহ' যার আলোচনা আজকাল বারবার পত্রপত্রিকায় আসছে। [৪১]

রুশরা এশিয়া ও ইউরোপ– সালতানাতের দুই প্রান্তে জোরালো হামলা শুরু করল। তুর্কিদের 'হিরো' ছিলেন ইউরোপে উমর পাশা এবং এশিয়াতে আবদুহু পাশা। দুজনই বীরত্বের সাথে রুশদের মোকাবিলা করেছে। শত

[৪১] এই যুদ্ধে ইংল্যান্ড সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফার পাশে দাঁড়িয়েছে বলে প্রচার করত। উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজ সরকারের প্রতি হিন্দুস্তানের মুসলিমদের আশ্বস্ত করা। – অনুবাদক

রকমের বাঁধাবিপত্তি সত্ত্বেও তারা তাদের কীর্তি ও কৃতিত্বের মাধ্যমে জগতবাসীকে হতবাক করে দিয়েছে। এই যুদ্ধ ১৮৫৩ সালে শুরু হয়ে ১৮৫৬ সালে সমাপ্ত হয়।

মুসলিমদের গৃহযুদ্ধে উসমানিদের ভূমিকা

তুর্কিস্তান ও ককেশাসে যে সব ইসলামি অঞ্চল ছিল, তা হিজরি দশম শতকে এবং ষোড়শ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ছোটছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক অঞ্চলে সিংহাসন বাগানোর জন্য গৃহযুদ্ধ চলমান ছিলো। আফগানিস্তানের কাছে তুর্কিস্তানের একটি অঞ্চল দুই তৈমুরিদের হাতে ছিল। বদখশানে হুমায়ুনের ভাই শাসক ছিল। মাওরাউন্নাহরে আব্দুল লতিফের মৃত্যুর পর গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

মাওরাউন্নাহরের রাজধানী সমরকন্দ। আব্দুল লতিফ খানের মৃত্যুর পর তার জানেশীন বা স্থলাভিষিক্ত হয় বুরাক খান, বালখে মুহাম্মাদ খান, কুন্দুজ ও তিরমিজে তার ছোট ভাই এবং বুখারায় বুরহান সাইদ খান নিজ নিজ আধিপত্য কায়েম করে রেখেছিল। এদের প্রত্যেকেই উসমানি খেলাফতের আশ্রয়-প্রশ্রয় কামনা করতো। সুলতান মাওরাউন্নাহর ও তুরানের আসল উত্তরাধিকারী বুরাক খানকে সাহায্য করাটাই যথোচিত মনে করলেন। সে সময়ে সামরিক শৃঙ্খলা, তোপ ও বন্দুক কেবল তুর্কি বাহিনীর মতো কারুর ছিল। ৩০০ নিগচারি সেনা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করে খুবই কৌশলেও গোপনভাবে ইরানের সাফাবিদের চোখ এড়িয়ে বুরাক খানের কাছে পাঠান। এই কয়েক শ' সৈনিকের দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও আধুনিক অস্ত্রের ক্ষমতা বুরাক খানের জন্য বিশেষ রহমত হয়ে দেখা দেয়। এবং এদের মাধ্যমে এই সব দেশে আধুনিক অস্ত্রের প্রসার ঘটে।[৪২]

শাহজাহান তার শাসনামলে বুখারাকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা করেন এবং হিন্দুস্তান থেকে এক বিশাল বাহিনী পাঠান। এই অভিযানের পূর্ণ বৃত্তান্ত হিন্দুস্তানের ইতিহাসের বইগুলোতে মওজুদ আছে। তুরানের শাসক সুলতান সুলাইমানের দরবারে আবেদন পাঠান। সুলতান সুলাইমান শাহজাহানকে যে চিঠি পাঠান এবং শাহজাহান যে উত্তর দেন তার বিবরণ আজও ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। সুলতান সুলাইমান এই দুই মুসলমান

[৪২] তুর্কি সামুদ্রিক সেনাপ্রধান সাইয়্যিদি আলি তার সফরনামায় এসব লিপিবদ্ধ করেছেন।

বাদশাহর মধ্যে সন্ধির মাধ্যমে ও শান্তিপূর্ণভাবে এই দ্বন্দ্ব মেটানোর সবরকমের চেষ্টা করেছেন।[৪৩]

খিভা শহরে সুলতান সুলাইমানের আমল থেকেই মুহাম্মাদ খানের শাসন ছিল। তার প্রতিপক্ষ হাজি খান ও তার ভাই আইশ সুলতানকে হত্যা করে নিজেই শাসক হয়ে যায়। খিভায় মুসলিমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত ছিল। আর এর কিছু বছর পরই রুশরা মুসলিমদের আস্ত্রাখানের ইসলামি সালতানাতকে ধ্বংস করে দেয়। রুশরা যখনই সুযোগ পেত সামনে বাড়তো। তুর্কি নৌ সেনাপতি যখন সে সময়ে অর্থাৎ ৯৬৫ হিজরি মোতাবেক ১৫৫৬ খৃস্টাব্দে সে দেশ অতিক্রম করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ করলেন, সবখানে জনগণ রুশদের আগমনের আতঙ্কে আছে। রাস্তায় যেসব লোকদের তার সাথে সাক্ষাত হয়েছে তারা হয়তো পালিয়ে আসছিল নয়তো লুণ্ঠনের শিকার হয়ে আসছিল। যদিও রুশরা বহু বছর যাবত সেদিকে নজর দেয়নি; তবে কিছু অমুসলিম তাতারি ছিলো সে অঞ্চলে, যারা সেখানকার লোকদের উপর জুলুম করত। এসব তাতারিরা বিনা বাক্যব্যয়ে রুশদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসত। সালতানাতে উসমানিয়া সতের শতকের শেষ দিকে কিংবা আঠারো শতকের শুরুতে ফাররুখ পাশাকে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য পাঠান ।[৪৪]

খেলাফতের শেষ সময়গুলোতেও উসমানিগণ উম্মাহকে ভুলে যায়নি

বুখারা ও খিভার শাসন উনিশ শতকের শেষের দিকে রুশদের হাতে আসে। অর্থাৎ ১৮৮০ সালে যখন ইংরেজরা খেদেভি মিসরকে এবং ফরাশিরা যখন বে অব তিউনিসকে তাদের রাজধানি বানায়। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে বুখারার আমির রুশদের সাথে ও খিভার আমির ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে রুশদের সাথে রক্তাক্ত লড়াইয়ের পর রুশদের অধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

এটা ছিল সেই সময় যখন শত্রুদের চতুর্মুখী হামলার দরুন উসমানি খেলাফতের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। তবুও এই নাজুক পরিস্থিতিতেও তার পক্ষে যা করা সম্ভব ছিলো তা করতে দ্বিধান্বিত হয়নি। তাই তো সুলতান আব্দুল হামিদ উনিশ শতকের মধ্যভাগে বুখারার আমির– সুলতান আব্দুল মাজিদ

---

[৪৩]ফাইয়াজুল কাওয়ানিনের পাণ্ডুলিপিতে এই চিঠি বিদ্যমান আছে।

[৪৪] মিরআতুল মামালিকের উর্দু অনুবাদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

খানের কাছে বুখারাবাসীদের আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা শেখার জন্য এবং আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা অনুসারে সৈন্যদেরকে গঠন করার জন্য তুর্কি সেনাঅফিসার ও যুদ্ধপ্রশিক্ষক পাঠান।[৪৫]

তুর্কিস্তানের কাশগরকে চীন দখল করে নিয়েছিলো। কাশগরের আতালিক (মহান নেতা) গাজি ইয়াকুব খুশবেগি চিনাদের থেকে বের হয়ে স্বতন্ত্র সালতানাত কায়েম করেন। সুলতান তার কাছেও সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। সেনাদের প্রশিক্ষণের জন্য তুর্কি সেনা অফিসার ও প্রশিক্ষক পাঠান।[৪৬]

রুশরা এই এলাকাসমূহ দখলের পর মুসলিমদের উপর যে অমানুষিক নির্যাতন করেছে এবং রুশ মিসনারিরা মুসলিমদের খৃস্টান বানানোর জন্য নৃশংস জোর-জুলুম চালিয়েছে তার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করলে একটি লাইব্রেরি দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এসব অবর্ণনীয় জুলুম ও অত্যাচারের বৃত্তান্ত শুনে বসফরাসের কেনারায় বসবাসরত মুসলিমগণ[৪৭] ছাড়া আর কাদের অন্তর বিগলিত হয়েছে? কাদের চোখ অশ্রুসজল হয়েছে? কারা তাদেরকে এই অত্যাচার ও জুলুমের দুঃসহ চোরাবালি থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেছে?

উসমানিদের বিপক্ষে রুশদেশীয় মুসলিমদের গণস্বাক্ষর

খৃস্টীয় উনিশ শতকের শেষের দিকে রোম ও রুশদের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বার্লিনে সন্ধির জন্য কনফারেন্স বসে। তুর্কি প্রতিনিধি রুশ মুসলিমদের উপর রুশ খৃস্টানদের অকথ্য নির্যাতন ও অসহায়ত্বের কথা ইউরোপিয়ান সন্ধি-মজলিসের সামনে তুলে ধরেন। রুশ প্রতিনিধি এর প্রতিবাদে সেখানকার মুসলিমদের স্বাক্ষরিত একটি ডকুমেন্ট পেশ করে। রুশদের এই গণস্বাক্ষর হয়তো বানোয়াট ছিল নয়তো এতে কতিপয় মুনাফিক মুসলিমদের স্বাক্ষর ছিল। নতুবা এটা মুসলিমদের কাছ থেকে জোরপূর্বক আদায় করা হয়েছে। এতে বলা হয়, "মুসলিমদের উপর জুলুমের যে আখ্যান প্রচার ও প্রসার করা হয়েছে তা আপাদশীর মিথ্যা। আমরা শাহেনশাহে রুশের ছায়াতলে নিতান্তই শান্তি ও নিরাপদভাবে জীবন যাপন করছি।" এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর ভর্ৎসনা ও নিন্দার ঝড় সহ্য করা ব্যতীত তুর্কি প্রতিনিধির আর কোনো প্রত্যুত্তর ছিলো না।

---

[৪৫] মিরআতুল মামালিকের উর্দু অনুবাদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য

[৪৬] মিরআতুল মামালিকের উর্দু অনুবাদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য

[৪৭] উসমানি খেলাফতের রাজধানী বসফরাস প্রণালীর তীরে অবস্থিত ছিল। যা কনস্টান্টিনোপল বা অধুনা ইস্তাম্বুল বলে পরচিতি।

গণস্বাক্ষরের প্রকৃত সত্য বেরিয়ে এলো

পরিশেষে ১৮৯১ সালে রুশ মুসলমানদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। কাজানের আলেমরা আরবিতে এক হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী ফরিয়াদনামা লিখে হারামাইনের আলেমদের কাছে প্রেরণ করেন এবং অনুরোধ করেন, এটাকে যেনো শাইখুল ইসলামের মাধ্যমে আমিরুল মুমিনিন ও দীনের তত্ত্বাবধায়ক উসমানি খলিফার দরবারে পৌঁছে দেওয়া হয়।

এই ফরিয়াদনামার শুরুতে ও শেষে কিছু আরবি কবিতা যুক্ত করা হয়, যা শুনে এক মুসলমানের অন্তর হাহাকার ও আর্তনাদে ফেটে পড়বে।

হে আমাদের মান্যবরগণ আপনাদের মর্যাদা সুবিশাল !
আপনাদের ছায়ায় আমরা জুলুম থেকে বাঁচার আশ্রয় খোঁজি
নিজ দীনের প্রতিশোধ নিন, তার মদদ করুন
তার চারপাশে উড়ছে শকুন
আমরা যেখানে বাস করি সেখানে কেবল লাঞ্ছনা
যার পীড়নে শিশু পরিণত হয় বৃদ্ধে
শত্রুরা চতুর্দিক থেকে আমাদের প্রলুব্ধ করছে
ধনী গরিব সবাই এই ধোঁকায় আচ্ছন্ন
খৃস্টানরা আমাদের চিবিয়ে খাচ্ছে। কোন অন্তর আছে
বলুন এই অবস্থায় স্থির ও নির্বিকার থাকবে!
ইসলামের সমাধি রচিত হয়েছে, তার জন্য রক্তাশ্রু ঝরান
অন্তরের উত্তাপ কি অশ্রুধারা নেভাতে পারে!
হায়আফসোস! হায় আফসোস! এই দুঃখে
যতোদিন পৃথিবী থাকবে ততোদিন এই আর্তনাদ ধ্বনিত হবে
এই দুর্দশা যখন আপতিত হয় আমরা বিকট শব্দে আর্তনাদ করি
কিন্তু দুর্বল প্রাণীর আওয়াজ কে শুনতে পারে হায়!
আমাদের সাহায্যের জন্য কি কোনো আত্মমর্যাদাশীল
বাদশাহ আছেন?
যে বিপদ নিয়ে খেলতে পছন্দ করেন!

ফরিয়াদনামার শেষে এই মর্মস্পর্শী কবিতার কয়েকটি পঙক্তি ছিল। এই কবিতাটি আন্দালুসের মুসলিমরা তাদের পতনের সময় সারা দুনিয়ার মুসলিমদের উদ্দেশ্যে লিখেছিল ।

রুশদেশীয় মুসলিমদের আকুতি ও উসমানিদের জবাব

হারামাইনের আলেমরা এই ফরিয়াদনামায় দস্তখত করে ছাপিয়ে বিচারক ও অমাত্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। আর এর কিছু কপি কনস্টান্টিনোপলের আলেমদের কাছে পাঠিয়ে দেন। তাদের কাছে এই ফরিয়াদনামা পৌঁছার পর একটি অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ইলদিজ জামে মসজিদে সুলতান জুমার নামাজ আদায় করতেন। এক তেজোদ্দীপ্ত আলেম সাইয়্যিদ আসআদ মাদানি মুআজ্জিনকে নির্দেশ দিলেন জুমআর দিনে এই ফরিয়াদনামা শাইখুল ইসলামের সামনে উপস্থাপন করা হবে। উক্ত আলেম নিজে এই ফরিয়াদনামার তুর্কি অনুবাদ করে সুলতাকে শোনান। সুলতান তার রুশ-দূতের মারফতে একটি পত্র রুশ হুকুমাতের কাছে পাঠান। এক রুশ মুসলিম ঐতিহাসিক লেখেন, এই পত্রের বিপুল ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। মুসলিমদের দুর্দশা অনেকটাই কমে আসে। রুশদেশে তাদের শিক্ষা ও উন্নয়নে সমান সুবিধা অর্জন হয়।

আফগানিস্তানে উসমানিদের অবদান

নাদির শাহের পরে আফগানিস্তান রুশ ও ইংল্যান্ডের রাজনীতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পড়ে। তুর্কিস্তান ও কাজানের মুসলিমদের সাথে রুশদের আচরণ দেখে আফগানিস্তানের শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল। তাদের উচিত ছিল, রুশদের বদলে ইংল্যান্ডের সহায়তা করে নিজেদেরকে বিপদমুক্ত রাখা। সুলতান নিজের এক দূত পাঠালেন আফগানিস্তানের আমিরের কাছে। আমির আব্দুর রহমান খান তুজুকে লেখেন, যেহেতু এটা সুলতানের প্রতিনিধির প্রথম আগমন ছিলো এজন্য সে মনে করলো এই প্রতিনিধি হয়তো সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নবিশ।

খুব সম্ভবত আমির শের আলি খান ১৮৭৭ সালে রুশদের ইশারায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি নিলেন। সীমান্তে জিহাদের জোরোশোরে প্রচার শুরু করেন। এই উপলক্ষে সুলতান তার একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে আমিরকে তা থেকে বিরত রাখলেন। আমির আব্দুর রহমান তার তুজুকে লেখেন, সুলতানের এই ফরমান খুবই কার্যকর ভূমিকারাখেন। আমির শের আলি খান তার গতিবিধি পাল্টে ফেলেন। রুশরা এই পরিকল্পনাকে বাঞ্চাল ও অকার্যকর করার জন্য প্রচার করতে লাগলো, এই প্রতিনিধি সুলতানের না; বরং নকল প্রতিনিধি।

এরপর আমির আব্দুর রহমান খান স্রষ্টাপ্রদত্ত আফগানিস্তানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এবং সালতানাতের রীতিনীতি সংশোধন করেন।

আফগানিস্তানে নতুন সময়ের সূচনা হল। এই সময়েও তুর্কিরাই আমিরকে সহযোগিতা করেন। তুর্কি অফিসাররা এসে আফগানিস্তানের সেনাদের প্রশিক্ষণ দেন। তাদেরকে আধুনিক অস্ত্রচালনা শেখান। এমনকি কাবুলে সমরবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। আল্লাহর রহমতে তা আজও বহাল আছে।

বলাবাহুল্য, ককেশাশের ইসলামি ভূখণ্ডসমূহ তুর্কিরা এমনিতেই হাতছাড়া করেনি। বরং তারা হাতছাড়া করেছে তাদের লাশ ও রক্তের সুমহান আত্মত্যাগের পর। সেখানকার এমন কোনো মাটি নেই যা তুর্কিদের রক্তে সিক্ত হয়নি।

পরিশেষে এই দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা আশা করি পাঠক মহোদয়গণ সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন খেলাফতে উসমানিয়া মুসলিম বিশ্বের সেবা ও দায়ভার কিভাবে আদায় করেছেন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী কিভাবে তারা এই মহা দায়িত্ব অম্লানবদনে পালন করে গেছেন।

খেলাফতে উসমানিয়া এবং খৃস্টান ও মুসলিমবিশ্বের ঋণস্বীকার

খেলাফতের দায়িত্ব পালনে উসমানিগণ কতোটা সফল

তুর্কিদের খেলাফত প্রকৃতঅর্থে খেলাফত কি না কিংবা আদৌ খেলাফত হওয়ার যোগ্যতা রাখে কি না, এবিষয়ে বিস্তর আলোচনা সামনে এসেছে। এসব আলোচনার বিষয় এটা নয় যে, খলিফা কুরাইশ বংশের হওয়া শর্ত কি না; কিংবা খেলাফতের কতিপয় শর্ত অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন কেউ যদি নিজেকে খলিফা দাবি করে তাহলে তাকে মানা যাবে কি না? কিংবা একজন দাবিদারের মধ্যে যদি কুরাইশ হওয়ার শর্ত ছাড়া অন্য শর্ত বিদ্যমান থাকে এবং আরেকজনের মধ্যে যদি কুরাইশ ছাড়া আর কোনো শর্ত বিদ্যমান না থাকে তাহলে কাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে? বরং এই আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সবরকমের অসম্পূর্ণতা ও খলিফার শর্ত পূরণে অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইসলামি বিশ্ব ও ইসলামি বিশ্বের অধিকাংশ দেশসমূহ উসমানি সুলতানদের খেলাফত ও নেতৃত্ব কতটুকু মেনে নিয়েছে এবং তাদের প্রতিপক্ষ ইউরোপিয়ান ও খৃস্টান শাসকরা তাদের এই মাহাত্ম্য কতটুকু মেনে নিয়েছে কিংবা স্বীকৃতি দিয়েছে।

এবিষয়ে দলিল ও প্রমাণ দেওয়ার জরুরত নেই যে, বিগত চার শতাব্দীতে তুর্কি ও মুসলিম সমার্থবোধক শব্দে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। একইভাবে নবিয়ে আরবি সা. এর নাম সে সময়ে 'তুর্কিদের পয়গাম্বর' ছিল। এখনো ইউরোপে রমজান মাসকে তুর্কি মাস বলা হয়। মোটকথা বিগত চার'শ বছরের সম্পূর্ণ সময়ে ইসলামের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র যাই বলা হোক সব কিছুর কৃতিত্ব তারই ছিলো। তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ ইসলামের সাথে যুদ্ধ এবং তুর্কিদের সাথে সন্ধি ইসলামের সাথে সন্ধি মনে করা হত। কেবল মুসলিমরাই নয় বরং অমুসলিমরাও সর্বদা এমনটাই মনে করত। সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ইসলামের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার রক্ষক, নিপীড়িত মুসলিমের হিতাকাঙ্খা, সহযোগিতা, শাআইরে ইসলামের প্রতিষ্ঠা, ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমানার হেফাজত, পবিত্র স্থানসমূহের সেবার যাবতীয় দায়িত্ব উসমানি খেলাফত পালন করেছে। কেবল উসমানি খেলাফত পালন করেছে। আর এটাই খেলাফত ও ইমামতের দায়িত্ব। এছাড়া আর কী? এই দায়িত্ব যারা এককভাবে সারা দুনিয়ায় পালন করেছে তারা আমিরুল মুমিনিন এবং

ইমামুল মুসলিমিন নয় কি? এটা অবশ্য সত্য যে তাদের মধ্যে কেউ উমর ফারুক রা. এবং উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রা. ছিলেন না ঠিক; কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ তো আর সাহাবি ও তাবে তাবিঈন নন!

আরবরা কি উসমানিদের খলিফা মনে করতো

জনশ্রুতি আছে, আমাদের আরব ভাইরা তুর্কিদের এই অগ্রবর্তিতা বা নেতৃত্বকে অস্বীকার করতেন। এজন্য আমাদেরকে প্রথমেই তাদের আলোচনা দিয়ে শুরু করতে হবে। যখন সুলতান সালিম মিসর ও আরবকে নিজের অধীনে এনেছেন তখন মিসরের রাজকর্মকর্তাগণ ইয়ামানের আরবদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। মিসরের মামলুক সুলতানের পক্ষ থেকে মিসরের যে গভর্নর ছিলো সে ঐ সময় আরব মরুভূমিতে আরব গোত্রপতিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। কিন্তু যুদ্ধের এই চরম মুহূর্তে যখন সুলতান সালিমের নিবেদন তার শ্রুতিগোচর হল এবং যখন সে উপলব্ধি করতে পারলো ইরাক শাম ও হিজাজের বিরাট সংখ্যক মুসলিমরা জুমআর খুতবায় এই সুলতানের নামই তো উচ্চারণ করছে, তখন সবার প্রথমে সেই তার আনুগত্য মেনে নিলো। জনসম্মুখে তার আনুগত্যের ঘোষণা দেন। রাওহুর রুহের ইয়ামানি লেখক বলেন,

> যখন মিসরি গভর্নর ইসকান্দার ইয়ামানে মিসরের বিজয়সুলভ পরাজয় এবং সুলতান সালিমের বিজয়ের খবর শুনলো তখন তিনি তার নিরাপত্তার জন্য জনগণকে জামে মসজিদে সমবেত করেন এবং ইসলামের সুলতান সালিমের মিসর বিজয়ের ঘোষণা দেন। ইয়ামানের রাজধানী সানআর জামে মসজিদের মিম্বারে খুতবা পড়েন এবং সুলতানের সাথে একাত্মতাপোষণ করে নিজেকে আরো শক্তিশালী ও মজবুত করেন।

আরব গোত্রপতি ও আমিরদের মধ্য যে সবচে বেশি তুর্কি প্রশাসকদের অনধিকারচর্চাকে প্রতিহত করেছে সে হলো ইয়ামানের আমির। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, সর্বপ্রথম সেই উসমানি খেলাফতের আনুগত্যের আহবানে সাড়া দিয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে সেসময়ে সুলতান সুলাইমান ও ফখরুদ্দিন মুতাহ্হির বিন শরফুদ্দীনের মধ্যেযে সরকারি চিঠিপত্র আদানপ্রদান হয় আমাদের কাছে হাজির আছে। এই বিরল ঐতিহাসিক সম্পদকে কোনো এক রুচিশীল ব্যক্তি ইয়ামানের হস্তলিখিত ইতিহাস রাওহুর রুহের পাণ্ডুলিপির পরিশিষ্টে যুক্ত করে দিয়েছেন। এই পাণ্ডুলিপির

কপি বিদ্বান ও পণ্ডিত আলেম হাজি আব্দুল কারিম (আল্লামা শিবলি নুমানি রহ. এর চাচা) আরব থেকে সাথে করে হিন্দুস্তানে নিয়ে আসেন। এখন তা 'দারুল মুসান্নিফিনে'র মালিকানাধীন রয়েছে।

সুলতান সুলাইমান তার চিঠিপত্রে ইয়ামানের শাসকের আভিজাত্য ও তার নেতৃত্বের যথাযথ সম্মান করেন। পর্তুগিজদের সাথে যুদ্ধে ইয়ামানের সাবেক ইমাম যে সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি বশ্যতা বা আনুগত্য মেনে নেওয়ার জন্য তার অনেক প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আপনার পিতা সবার আগে আমার আনুগত্য কবুল করেন। এই পত্রের জবাবে মুতাহহির আল্লাহর হামদ ও রাসুলের নাতের পর সুলতানের উদ্দেশ্যে এই লকবগুলো নিবেদন করেন,

> খেলাফতের আসমানের সূর্য ও অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে খেলাফতের উজ্জ্বল চন্দ্র, স্রষ্টার জমিনে স্রষ্টার ছায়া, স্রষ্টার সুস্পষ্ট দলিল, স্রষ্টার সকল সৃষ্টির উপর তার কল্যাণময়তার দলিল, তার সৃষ্টির দায়িত্বরত আস্থাভাজন এবং তার হক কায়েমকারী খলিফা।

তারপর তিনি তার আনুগত্য ও হিতচর্চার ব্যাপারে সুলতানকে আশ্বস্ত করেন এবং কয়েকটি হাদিস উদ্ধৃত করেন আমির ও সুলতানের আনুগত্য বিষয়ে।

যে কিতাবের সাথে এই পত্রাবলি সংযুক্ত করা হয়েছে তার নাম রাওহুর রুহ বাদাল মিআতিত তাসিআতি মিনাল ফুতুহ। এই কিতাবটিতে হিজরি নবম শতকের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। লেখকের নাম ঈসা বিন লুতফুল্লাহ বিন মুতাহহির বিন শারফুদ্দীন। মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় লেখক ইয়ামানের ইমাম মুতাহহির বিন শরফুদ্দীনের পৌত্র। ৯০১ হিজরি থেকে ১০২৮ হিজরি পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলি এখানে আনা হয়েছে। লেখক প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন স্থানে উসমানি খলিফাদের আলোচনা করেছেন এবং তাদের শাসন ও নেতৃত্বের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি ও ঘোষণা দিয়েছেন। কিতাবটির ভূমিকায় ইয়ামানের গভর্নর মুহাম্মাদ পাশার বিষয়ে আলোচনা এভাবে করা হয়েছে,

> আমাদের অভিভাবক ও আমাদের মালিক। আমাদের খলিফার খলিফা ও প্রতিনিধি।

বইয়ের মাঝখানে যেখানেই উসমানি সুলতানদের নাম এসেছে সেখানেই তাদের নামের সাথে সরকারি উপাধি যুক্ত করেছেন। কখনো বা সুলতানুল ইসলাম (ইসলামের সুলতান) কখনো বাদশাহে ইসলাম (ইসলামের

বাদশাহ) কিংবা এজাতীয় অন্য কোনো উপাধি যুক্ত করেছেন। যার সবগুলো এখানে উল্লেখ সম্ভব না। সুলতান সালিমকে বলেছেন সুলতানুল ইসলামি ওয়াল মুসলিমিন (ইসলাম ও মুসলিমদের সুলতান)

৯৭৬ হিজরি সনে যখন এডেন বিজয় হলো,সেখানে 'সুলতানুল ইসলামে'র খুতবা পড়া হলো। ৯৮২ হিজরি সনে যখন সুলতান দ্বিতীয় সালিম বিন মহান সুলাইমান মৃত্যু বরণ করেন এবং তার স্থলে সুলতান মুরাদ আসীন হন । তার স্মৃতিচারণ লেখক এভাবে করেছেন,

> সুলতানুল ইসলামি ওয়াল মুসলিমিন জিল্লুল্লাহি আলাল আলামিন (ইসলাম ও মুসলিমদের সুলতান, জগৎসমূহের উপর আল্লাহর ছায়া) সালিম বিন সুলাইমান খান ইন্তেকাল করেছেন। তার স্থানে মহান সুলতান আরব ও অনারবের বাদশাহ সুলতান মুরাদ সমাসীন হয়েছেন। আল্লাহ তাকে তার খেলাফতের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছে দিক।

হিজরি নবম শতকে বাগদাদের একজন প্রসিদ্ধ আলেম হলেন মুফতিয়ে আজম মুফতি আবুস সাউদ বাগদাদি। তার আরবি ভাষায় রচিত বিশাল তাফসিরকে মুতাআখখিরিন (পরবর্তীকালের) আলেমদের তাফসিরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং হানাফি আলেমদের নিকট সবচে গ্রহণযোগ্য তাফসির বিবেচনা করা হয়। তিনি তার এই মহান গ্রন্থের ভূমিকায় সুলতান সুলাইমানের আলোচনা করেন,

> যাকে আল্লাহ জমিনের খেলাফতের গুণে গুণান্বিত করেছেন, জমিনের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে আধিপত্য করার জন্য মনোনীত করেছেন, মহান নেতৃত্বের মালিক ও দীপ্যমান সুলতান, মহান খেলাফতের ওয়ারিশ, পৃথিবীর মিম্বারসমূহ তার পবিত্র নামে সম্মানিত হয়েছে, দুই প্রাচ্যের বাদশাহ, দুর্দশাগ্রস্তদের বাদশাহ,আল্লাহপ্রদত্ত বলে বলীয়ান বাদশাহ,আল্লাহপ্রদত্তসম্মানে সম্মানিত, মহিমান্বিত ও পবিত্র হারামদ্বয়ের (মক্কা ও মদিনা) গর্বিত খাদেম।

সুলতান সুলাইমানের মৃত্যুতে মুফতি সাহেব অনবদ্য এক মর্সিয়া কাব্যও রচনা করেছিলেন। যাতে সুলতানের প্রতি তার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সুস্পষ্ট।

> *এ কি বজ্রপাত নাকি ইসরাফিলের ফুঁৎকার!*
> *কেনো জমিন শিঙ্গার রবে কম্পমান!*
> *সকল হৃদয় জর্জরিত সকল হৃদয় বহু খণ্ডে বিদীর্ণ*

জনগণের চোখ রক্তভরা সাফিনা যেনো যা অশ্রুর উদ্বেল সমুদ্রে চলমান
নাকি যার হুকুমে সকল মানুষ চলতো সেই হাকিমের মৃত্যুসংবাদ
নাকি এই জামানার সুলাইমানের মৃত্যুসংবাদ ইহা
সে তো জগতের রাজত্বের রাজা ও আধিপত্যের কেন্দ্র ;
সে তো আল্লাহর খলিফা, জগতজুড়ে তার নাম।

তারপর মুফতি সাহেব সুলতানের জানেশীনের সিংহাসনারোহণকে স্বাগত জানিয়ে বলেন,

> সম্মানিত জ্ঞানী সম্রাট; যার স্পর্শে সিংহাসনের সম্মান ও মর্যাদার প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে উমর গুজরাটি, যার মতো মনীষার জন্মে হিন্দুস্তান ধন্য; যদিও তার শিক্ষা, বেড়ে ওঠা ও প্রসিদ্ধি পবিত্র মক্কায় হয়েছে। তিনি হাজি দবির মক্কি নামে সমধিক পরিচিত। তিনি আরবি ভাষায় গুজরাটের বাদশাহদের উপর 'জাফর আলওয়ালিহ বিমুজাফ্ফার ওয়া আলিহ' নামে একটি ইতিহাস রচনা করেন। ইন্ডিয়ান সরকার ১৯১০ সালে রাষ্ট্রীয় অর্থে এই বইটি লন্ডন থেকে প্রকাশ করে। হাজি দবির মক্কি সুলতান সুলাইমানের সময় বিদ্যমান ছিলেন। ৯৪৬ সালের ঘটনবালি পর্যন্ত তিনি বর্ণনা করেছেন। হাজি সাহেব তার কিতাবে বলেন,

> রোমের সুলতান ছিলো রোমের। আর তিনি তার সময়ে ছিলেন সকলের জন্য ইসলামের সুলতান। সমগ্র দুনিয়ার জন্য আল্লাহর খলিফা। তিনি হলেন সুলাইমান খান বিন সালিম খান।[৪৮]

আরেকজন আলেম হলেন, আল্লামা কুতুবুদ্দীন নাহরওয়ালি (এটা গুজরাটের প্রসিদ্ধ একটি স্থান) । তিনি মক্কার বাসিন্দা ছিলেন। গুজরাট সুলতানদের অর্থায়নে মক্কায় যে মাদরাসাটি কায়েম ছিল, সে মাদরাসার পরিচালক ও প্রথম শিক্ষক ছিলেন তিনি। গুজরাট সালতানাতের পতনের পর সুলতান সুলাইমান মক্কায় চার মাজহাবের ইমামের নামে চারটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্য থেকেমাদারাসায়ে হানাফিয়্যাহকে আল্লামা কুতুবুদ্দীনের হাতে সোপর্দ করা হয়। সেসময় থেকে সুলতান মুরাদের সময় পর্যন্ত এই পদে তিনি বহাল ছিলেন। তার কতিপয় রচনার মধ্য একটি হল মক্কার ইতিহাসসংক্রান্ত বই, 'আল ইলাম বিআলামি বাইতিল্লাহিল হারাম'। তার

---

[৪৮] ৩১৬ পৃষ্ঠা

এই বইয়ে যেখানেই উসমানি সুলতানদের নাম এসেছে খুবই সমীহ ও সম্মানের সাথে উল্লেখ করেছেন। যেমন,

> জগতের অধিপতি ও সুলতান, আমিরুল মুমিনিন, যিনি খেলাফতের আসনে সমাসীন। আল্লাহ তার খেলাফত এবং তার বংশধরদের খেলাফত ও সালতানাতকে কায়েম রাখুন।[৪৯]

পবিত্র হারামের ভবনসমূহ নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ সুলতান সালিম বিন সুলাইমানের সময় থেকে শুরু হয়ে সুলতান মুরাদের জামানায় শেষ হয়। নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার পর ভবনে একটি বৃহৎ আরবি ক্যালিওগ্রাফি তৈরি করা হয়। যে ক্যালিওগ্রাফি বাবে আব্বাস থেকে শুরু করে বাবে আলি পর্যন্ত খচিত ও বিস্তৃত। তাতে লেখা ছিল,

> আল্লাহর যে বান্দা শরিয়তের বিধান পালনে সচেষ্ট। অর্থাৎ সুলতান মুরাদ। আল্লাহ তার মধ্যে এবং তার সন্তানদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত খেলাফত বাকি রাখুক, অটুট রাখুক। সকল বিপদ থেকে তাকে মুক্ত রাখুক এবং কেয়ামত পর্যন্ত তার বংশধরদেরকে খেলাফতের আসনে দৃঢ় রাখুক। তারপরে আল্লাহ খেলাফতের আসনে তার ছেলেকে আসীন করেছেন।

সিনান পাশা যখন দ্বিতীয় বার ইয়ামান বিজয় করে, তো আল্লামা নাহরওয়ালি নিম্নের এই বিজয়গাঁথা রচনা করেন–

> *এই জামানার সুলতান আমাদের বাদশাহ এবং এই জামানার খলিফার সেনাবাহিনি*
>
> *রাজ্যশাসনের সিংহাসনে তার মজবুত ভিত্তি রয়েছে।*
>
> *তার মহান ও নামজাদা পূর্বসূরীদের থেকে এই উত্তরাধিকার সে পেয়েছে*
>
> *তার পূর্বসূরীদের অনেকে সুউচ্চ আসনে বিরাজমান ছিল।*
>
> *স্বসময়ে অনেকে দৃঢ় মনোবল ও শাসনাধিরাজ ছিল।*
>
> *এই স্তম্ভের ছায়ায় মুসলিমরা আশ্রয় সন্ধান করে,*

---

[৪৯]আল ইলাম বিআলামি বাইতিল্লাহিল হারাম, পৃষ্ঠা৪

কুফরের আক্রমণ থেকে তাদেরকে হেফাজত করার সুদৃঢ় প্রাচীর।

এছাড়াও আরো অনেক জায়গায় আল্লামা কুতবি এজাতীয় মনোভাব ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। মক্কা মুআজ্জামার শাইখ, মুহাদ্দিস ও মুফতি ওয়াহলানের কিছু কথাও এখানে বলে নেওয়া জরুরি। তার মৃত্যুর হয়তো ২৫ বছর অতিবাহিত হয়েছে। তিনি তার সময়ে অধিকাংশ ইসলামি ভূখণ্ডের মুহাদ্দিসদের উস্তাদ ছিলেন। হিন্দুস্তানের অনেক আলেমও তার থেকে হাদিসের সনদ নিয়েছেন। তার একটি অমরকীর্তি হল, 'আল ফুতুহাতুল ইসলামিয়্যাহ'। তিনি তার এই বইয়ে সুস্পষ্টভাবে খেলাফতে উসমানিয়ার খেলাফতকে গ্রহণ করেছেন। বহুস্থানে তিনি তাদের 'খলিফা' বলে সম্বোধন করেছেন।

মিসরের কাজিউল কুজাত সাইয়্যিদ আব্দুল্লাহ জামালুদ্দীন 'আস সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ' নামে একটি কিতাব রচনা করেন। রোডিস দ্বীপের অভিজাতদের নেতা আব্দুল্লাহ এই বইটি ছাপিয়েছেন। বইটি মিসরে প্রকাশিত হয়। সেখানে খুব সহজলভ্য। কাজি সাহেব এই বইয়ে দুই জায়গায় খেলাফতে উসমানিয়ার আলোচনা করেছেন। এক জায়গায় বলেন,

> 'খেলাফত আমার পরে ৩০ বছর থাকবে' এই হাদিসটি বুঝাচ্ছে, খেলাফতে রাশেদার খেলাফত হল পূর্ণাঙ্গ খেলাফত। তবে এছাড়া ইসলামি নেতাদের অন্যান্য খেলাফতকেও খেলাফত বলা যাবে। কেননা তাদের খেলাফতের সাধারণ রূপটি রাসুলের খেলাফতের প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন উসমানি খলিফাগণের খেলাফত। আল্লাহ তাদের কবরকে আলোকিত করুক।[৫০]

আরেক জায়গায় বলেন,

> জনগণকে শাসন করার হক খেলাফতের আছে এবং খেলাফতের মতো মহান উদ্দেশ্যকে হাসিল করার চেষ্টা করা ওয়াজিব। আর খেলাফতে উসমানিয়া হল এমনই এক খেলাফত যার মধ্যেসেই সক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে।[৫১]

আল্লামা ওয়াহলান মাক্কি 'আল ফুতুহাতুল ইসলামিয়্যাহ' তে লেখেন, "বিভিন্ন কারণ ও শ্রেষ্ঠতার দিক বিবেচনা করে বলা যায়, খেলাফতে রাশেদার পর উসমানি খেলাফতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো সালতানাত নেই যারা

---

[৫০] ৬১ পৃষ্ঠা,আস সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ
[৫১] প্রাগুক্ত ২০৮

ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফ, সুন্নতের রক্ষণাবেক্ষণ ও ইসলামি শাআইরকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।"

আল্লামা নাহরওয়ালিও বিভিন্ন স্থানে উসমানিদের সুন্নাহর প্রতি যত্নশীলতা ও অনুসরণের কথা উল্লেখ করেছেন। মুতাআখখরিন হানাফিদের অন্যতম ফকিহ ও দুররে মুখতারের টীকাকার আল্লামা তাহতাভি একটি বিশেষ পুস্তিকা লেখেন, যার বিষয়বস্তু, 'ইনশাআল্লাহ উসমানি খেলাফত সর্বদা দুনিয়ায় কায়েম থাকবে। কারণ এই মহান খেলাফত উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে শক্তিশালী করার চেষ্টায় কোন প্রকার ত্রুটি করেনি । এছাড়াও বহু আহলে কাশফ (অর্ন্তদর্শী ও দিব্যদর্শী) আলেমগণ মনে করেন এই খেলাফত ইমাম মাহদির আগমন পর্যন্ত টিকে থাকবে। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি এই খেলাফতে উসমানিয়া আলিয়্যাহকে তিনি যেনো কেয়ামত পর্যন্ত অটুট রাখেন। [৫২]

উপরের আলোচনা থেকে এটা খুব সহজেই অনুমান করা যায় পূর্ববর্তী আলেমরা খেলাফতে উসমানিয়া বিষয়ে কতো সুউচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। এখানে যাদের কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে তাদের মধ্যে হিন্দুস্তানী, ইরাকি, শামি, হিজাজি, মিসরি, ইয়ামানি আলেমরাও রয়েছে। এসব উদ্ধৃতির পর আমরা নিজস্ব মন্তব্য যুক্ত করে পাঠকের ভাবনাকে সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ করতে চাই না। পাঠকের কাছেই মূল্যায়নের গুরুভার ন্যস্ত করলাম।

আলেমদের পর আমির-উমারা, সুলতান ও সাধারণ মানুষদের মর্যাদা। সুন্নি মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি দেশ, যেমন, প্রাচ্যে- হিন্দুস্তান তুর্কিস্তান আফগানিস্তান এবং পশ্চিমে মারাকেশ- কেবল সরাসরি খেলাফতে উসমানিয়ার আওতায় ছিল না। এসব অঞ্চল ছাড়া আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপের যেসব অঞ্চল ইসলামি বিশ্বের মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল সকল অঞ্চলই খেলাফতে উসমানিয়ার কর্তৃত্বাধীন ছিল। যেমন আরব, ইরাক, শাম, মিসর, তরাবলিস, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, কুর্দিস্তান ককেশাস ও রোমদেশ এবং ইউরোপিয়ান তুর্কি অঞ্চল ইউরোপিয়ান রুশ অঞ্চল, উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি অঞ্চলের প্রতিটি মসজিদে খাদেমুল হারামাইন তথা উসমানি খলিফার মুবারক নাম উচ্চারিত হতো এবং এখনও হয়।

উসমানিদের বিষয়ে হিন্দুস্তানের লোকদের মনোভাব সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে শের শাহ, তাইমুরি

---

[৫২] ৭৮ পৃষ্ঠা, নাশওয়াতুশ শুমুল ফিস সাফারি ইলা ইসতাম্বুল, আল্লামা আলুসি জাদাহ, বাগদাদ

বাদশাহগণ গুজরাট ও সিন্ধের সুলতানগণ এবং মহিসুর, ভুপাল, দাক্ষিণাত্য ইত্যাদি অঞ্চলের আমির ও নবাবরা খেলাফতে উসমানিয়ার কতোটা গুণগ্রাহী ছিল। তাই এখানে তা পুনরায় বলা অনাবশ্যক।

সুলতান সুলাইমানের সময়ে বেলুচিস্তান অঞ্চলের শাসক ছিল জালালুদ্দীন বিন মালিক দিনার। নৌ সেনাপতি সাইয়্যিদি আলি পর্তুগালের সাথে যুদ্ধে ঘটনাক্রমে যখন তার ভগ্ন নৌযান নিয়ে বেলুচিস্তানের উপকূলে এসে পৌঁছে তখন সেখানকার শাসক জাহাজে এসে তার সাথে সাক্ষাত করেন। খলিফার প্রতি ভরসা আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন, আগামীতে সুলতানের নৌযান এদিকে আসলে ৫০/৬০ নৌকা রসদসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রস্তুত থাকবে।[৫৩]

তৈমুরিরা অক্ষম হওয়ার পর আফগানিস্তান স্বাধীন হয়। অন্যদিকে ইরানে সাফাবি সাম্রাজ্যের বাতি যখন নিষ্প্রভ হচ্ছিল তখন তৎক্ষণাৎ আফগানিস্তান এই সুযোগ কাজে লাগাতে উদ্যত হলো। আফগানিস্তানের বাদশাহ আশরাফ আবদালি তহমাসপ সাফাবিকে পরাজিত করে ইরান দখল করে নেয়।

সাফাভি সাম্রাজ্য একদম নতুন একটি সাম্রাজ্য ছিল। ককেশাশ থেকে রুশরা সামনে এগিয়ে আসছিল এবং উসমানি সালতানাত রুশদের সম্মুখাভিযান প্রতিহত করতে ব্যস্ত ছিল। এক পর্যায়ে রুশ ও তুর্কিরা একমত হয় যে, আশরাফকে সরিয়ে তহমাসপকে সিংহাসনে বসানো হবে। আশরাফ কনস্টান্টিনোপলে তার দূত মারফত চিঠি পাঠিয়ে বলে, এক মুসলিম বাদশাহর বিরুদ্ধে এক খৃস্টান বাদশাহর সাথে সন্ধি ও ফন্দি করে একজন মুসলিমের জন্য কিভাবে জায়েজ হয়? তুর্কি আলেমরাও একথায় তার সাথে একমত পোষণ করেন। তবে মন্ত্রী পরিষদ বলেন, সুলতান আমিরুল মুমিনিন এবং রাসুলের খলিফা, যে বাদশাহ আনুগত্য মানে না, খুতবায় সুলতানের নাম বলে না এবং খারাজ দেয় না, সে দীনের দুশমন। তার সাথে জিহাদ করা নাসারাদের সাথে জিহাদ করার চেয়ে উত্তম। এই দলিল শুনে আলেমগণও চুপ হয়ে যান। যাই হোক, পরিস্থিতি যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াল । এক পর্যায়ে সন্ধির মাধ্যমে উসমানি সুলতান আশারাফ আবদালিকে ইরানের বাদশাহ মেনে নিলেন এবং আশরাফ সুলতানকে খলিফা মেনে নিলেন।[৫৪]

---

[৫৩] সফরনামায়ে সাইয়্যিদ আলি, পৃষ্ঠা ২৩
[৫৪] তারিখুল আফগান, জামালুদ্দীন আফগানি পৃষ্ঠা ২১, মিশর

রুশদেশের মুসলিমদের আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। এক রুশ মুসলিম ঐতিহাসিক লেখেন, একবার এক মুসলিমের পেছনে গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হল। কারণ, তার সবচে বড় অপরাধ ছিলো, সে উসমানি খেলাফতের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করতো। মারাকেশ সম্পর্কে নিঃসন্দেহে এটা জানা থাকার কথা যে, যতক্ষণ তাদের ক্ষমতা ছিল তারা উসমানিদের মেনে নেয়নি। কেননা, তারা তাদের নেতৃত্ব, বংশীয় আভিজাত্য, এবং কুরাইশ হওয়ার দাবি করত। তাছাড়া তারা ফিকহিভাবে মালিকি মাজহাবের অনুসারী ছিল। যদিও এখন আর এসব প্রতিবন্ধকতা নেই।

উসমানি খেলাফত সম্পর্কে শিআদের মনোভাব

সুন্নি ইসলামি বিশ্বের বাইরে ইরানি শিআ ভাইদের দেখা মেলে। এই বিষয়ে যদিও তাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তবুও আমাদের দেখতে হবে তারা উসমানিদের 'খেলাফত'কে খেলাফত মনে করত কি না কিংবা তারা একে কোন দৃষ্টিতে দেখত কিংবা তারা এই খেলাফতকে সমগ্র সুন্নি মুসলিম জাহানের মুখপাত্র মনে করত কিনা। ইরানে সাফাভিদের এবং আরবে উসমানিদের উত্থান প্রায় একই সময়ে হয়। কখনো কখনো এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে ধর্মীয় গোড়ামি ও রাজনীতিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে আফসোসজনক রক্তারক্তিও হয়েছে। তবে তাদের বন্ধুসুলভ চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও হয়েছে। যার দ্বারা বোঝা যায় আমাদের শিআ ভাইগণ উসমানি সুলতানদের 'খেলাফতে'র দাবিকে কতোটা আন্তরকিভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

ইরানের প্রসিদ্ধ মুনশি (নথিকার) মির্জা তাহের ওয়াহীদ। যিনি ইরানের রাজকীয় মুনশি ছিলেন। তার শাহি নথিপত্রগুলো বাজারে পাওয়া যায় এখন। এতে কিছু রাজকীয় চিঠিপত্র রয়েছে। 'ফাইয়াজুল কাওয়ানিন' (যার রেফারেন্স আমরা পূর্বেও দিয়েছি) গ্রন্থেও এজাতীয় চিঠিপত্র সংকলন হয়েছে। এসব চিঠিপত্রে নজর বুলালে একটি গোপন সত্য সামনে আসে, সাফাভিরা শিআ হওয়া সত্ত্বেও উসমানিদের খেলাফতের দাবিকে মেনে নিয়েছে।

সুলতান মুরাদ বিন সালিমকে লেখা শাহ আব্বাস সাফাবির চিঠি

> আল্লাহ যার রক্ষণাবেক্ষণের খেয়াল রাখেন, মনোনীত রাসুলের শরিয়তের প্রসারকারী, যার মাথায় তুতিল মুলকা মান তাশাউ (তুমি যাকে খুশি রাজত্ব দাও– আল কুরআন) - এর ভাণ্ডার থেকে ইন্না জাআলনাকা খলিফাতান (আমি

তোমাকে খলিফা বানিয়েছি– আল কুরআন) এর সানন্দ মুকুট শোভা পায় ; ন্যায় ও ইনসাফের পতাকাবাহী ; শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানকারী। ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর ছায়া। জল ও স্থলের বাদশাহ। স্থলদ্বয় ও জলদ্বয়ের সুলতান। প্রাচ্যদ্বয় ও প্রতীচ্যদ্বয়ের হেফাজতকারী। সম্মানিত হারামদ্বয়ের সেবক।

সুলতান সুলাইমান বিন সালিমকে শাহে ইরানের চিঠি

গাজি ও মুজাহিদদের সুলতান, ধর্ম ও রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপনকারী, ইসলামের সীমানার সংরক্ষক, মুসলিমদের আশ্রয় ও সংস্থান, মহান মহান বাদশাহদের নিরাপত্তাদানকারী, মুসলিমদের কল্যাণচিন্তক, বিজয় ও উন্নয়নের পতাকাবাহী, ইসলামের প্রাসাদকে ভয় ও শংকা থেকে মুক্তকারী, জলদ্বয় ও স্থলদ্বয়ের সুলতান, হারামাইনের খাদেম, ইসলাম ও সকল মুসলিমের সাহায্যকারী সুলতান সুলাইমান শাহ বিন সুলতান সালিম খান, যার অবস্থান কুফর ও ইসলামের সীমানা হিসেবে স্বীকৃত এবং যার দরবার সকল মুসলিমদের হেফাজতের প্রাচীর।

সুলতান মুহাম্মাদের প্রতি তহমাসপের চিঠি

সকল মুসলিমদের সীমানার প্রহরী, ইসলামের পতাকাকে উন্নয়ন ও বিজয়ের ভিত্তিতে ধারণকারী, কাফের ও মুশরিকদের বধকারী, অত্যাচারী ও নৈরাজ্যবাদীদের নিশ্চিহ্নকারী, কুফুরের জয়জয়কার থেকে মুসলিমদের দেশকে রক্ষাকারী, শিরকের সংস্কৃতিকে সমগ্র পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্নকারী, কুফুরের আলামতকে সমগ্র দুনিয়া থেকে মোচনকারী, মুসলিমদের উপর যার অনুগ্রহের ধারা অবারিত, জলদ্বয় ও স্থলদ্বয়ের সুলতান, মানুষ ও জিনের পয়গম্বরের সমনামী সুলতান মুহাম্মাদ। খেলাফত, সালতানাত ও মাহাত্ম্য যাকে মহান করেছে।

সুলতান মুহাম্মাদের প্রতি

"মুসলিমদের সীমানার হেফাজতকারী। ইসলামি অঞ্চলের রক্ষাকারী, কুফর ও অন্ধকার নিশ্চিহ্নকারী,

কবিতা–

শিরকের অন্ধকারে ডোবা পৃথিবীতে আপনার বদৌলতে মসজিদ হবে সারা দুনিয়া।

স্থলদ্বয় ও জলদ্বয়ের বাদশাহ, হারামাইন শরিফের খাদেম।

সুন্নি-শিআ দ্বন্দ্ব নিরসনের অপূর্ব প্রচেষ্টা

সালানাতে সাফাভির পতনের পরের ঘটনা আরো বিস্ময়কর। নাদির শাহ যখন ইরানকে আফগানিদের থেকে মুক্ত করেন তখন সকল ইরানিরা তাকে অনুরোধ করে সে যেনো ইরানের বাদশাহ হন এবং খসরুদের মুকুট পরিধান করেন। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর তিনি যে শর্তে রাজি হন তা আমাদের শিআ ভাইদের জন্য খুবই শিক্ষণীয়। তিনি ইরানের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ও অমাত্যগণকে ডেকে একটি সমাবেশ করেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

> রাসুলে কারিম সা. এর ইন্তেকালের পর চারজন খলিফার আগমন হয়। যাদের খেলাফতের ব্যাপারে হিন্দুস্তান, রোম, তুর্কিস্তান একমত। ইরানও একসময় এবিষয়ে একমত ছিলো। শাহ ইসমাইল সাফাবি এসে দেশীয় বিশেষ উপকারিতা ও স্বার্থের কারণে বর্তমান মতবাদ চালু (শিআ মতবাদ) করেন। এর সাথে সাথে জনসাধারণ্যে সাহাবাদেরকে গালিগালাজ করার প্রবণতাও তৈরি হয়। যদি ইরানবাসী আমাকে শাসক বানাতে চায় তাহলে তাদের উচিত এই মতবাদ পরিত্যাগ করা। আর যেহেতু ফিকহ শাস্ত্রের শাখাগত বিষয়ে ইমাম মুহাম্মাদ জাফরও মুজতাহিদ ছিলেন তাই ফিকহের শাখাগত বিষয়ে ইমাম জাফর রহ. এর তাকলিদ করতে হবে।

সবাই তার কথা মেনে নেয় এবং নাদির শাহের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেয়। তারপর নাদির শাহ যে কথাগুলো বলেন তা শিআ ও সুন্নি উভয় পক্ষের জন্য আজও নেহায়েত শিক্ষণীয়।

> রোমের বাদশাহ, হারামাইন শরিফাইনের খাদেম ও আমাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আছে এবং তোমরা এখন যে প্রতিশ্রুতি পেশ করলে তার উপর ভিত্তিতে আমাদের উচিত এখন রোমের বাদশাহর কাছে চিঠি পাঠিয়ে পাঁচটি বিষয়ের উপর চুক্তিবদ্ধ হওয়া। যেনো উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ভেতর এই বিরোধের নিরসন হয়ে যায়।

নাদির শাহ যে পাঁচটি বিষয়ে সুন্নি বিশ্বের সাথে সন্ধি করতে চাইলেন তা হল,

১. জাফরি মাজহাবকে হানাফি মালেকি শাফেঈ ও হাম্বলি মাজহাবের সাথে পঞ্চম মাজহাব হিসেবে মেনে নেওয়া হোক।
২. মক্কায় অন্যান্য মাজহাবের মতো জাফরি মাজহাবের একটি মুসল্লা তৈরি করা হোক।
৩. প্রতি বছর ইরান থেকে একজন হজের আমির নির্ণয় করা হোক। উসমানি খেলাফত যেভাবে মিসর ও শামের হজের আমিরদের সম্মান ও সমাদর করে তেমনিভাবে তাকেও করতে হবে।
৪. উভয় সালতানাত একে অপরের কয়েদিদের মুক্ত করে দিক
৫. ভবিষ্যতে উভয় সালতানাতের রাজধানীতে অপর সালতানাতের একটি দূতাবাস রাখতে হবে।[৫৫]

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, সাফাবি শিআগণ কাদের কাছে সুন্নিবিশ্বের সাথে সমঝোতার পত্র প্রেরণ করেছে? সকল মুসলিম সালতানাতের মধ্য থেকে কাকে তারা সুন্নিবিশ্বের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র মনে করেছে? নিঃসন্দেহে খেলাফতে উসমানিয়াকে।

উসমানিদের খেলাফত সম্পর্কে ইউরোপিয়ানদের মনোভাব

উসমানিদের 'খেলাফত' ইউরোপিয়ান রাজনীতিচর্চার কেন্দ্রীয় ভাবনায় পরিণত হওয়ার পূর্বেই খৃস্টান বিশ্বের সকল দেশে এই খেলাফত সর্বজনস্বীকৃত একটি বিষয় ছিলো। এবিষয়ে লিখিত দলিলাদি ও নথিপত্রে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। খৃস্টান বিশ্বের স্বীকৃতির প্রথম উদাহরণ পাওয়া যায় আধুনিক ইউরোপিয় বিশ্বের প্রথম উন্নত রাষ্ট্র পর্তুগালের রাষ্ট্রদূতের ভারত আগমনের সময়। তুর্কি নৌসেনাপতি সাইয়্যিদি আলি গুজরাটের আহমেদাবাদে মন্ত্রী ইমাদুল মুলকের কাছে আসলে তার সাক্ষাৎ ঘটে পর্তুগিজ রাষ্ট্রদূতের। পর্তুগালের উক্ত রাষ্ট্রদূত বলেন,

> রোমের সুলতানের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক খুবই প্রয়োজন। আমাদের জাহাজগুলোকে তাদের বন্দরে ভিড়তে দেয়া হয় না। বন্দরে জাহাজ নোঙর করার অনুমতি না পেলে

[৫৫] ১৩০ পৃষ্ঠা, তারিখে নাদেরি, মুহাম্মাদ মাহদি আস্তারাবাদী, মোম্বাই

> আমাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে যাবে। তাছাড়া রোমসম্রাট তো মুসলিম বিশ্বেরও সম্রাট।[৫৬]

তখন ছিল মহান সুলতান সুলাইমানের রাজত্বকাল। এ সময় সালতানাতে উসমানিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয় (রিয়াইয়াতি আহদনামাহ)। যা ক্যাপিচুলেশন নামে কুখ্যাত। পরবর্তী কালে এটা তুরস্কের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত সন্ধিচুক্তিতে সুলতানের অবস্থান ছিল একজন খলিফার মতোই। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিদ্যার সবচেয়ে বড়ো এবং বিস্তৃত উৎস হিসেবে এনসাক্লোপিডিয়ার খ্যাতি আছে। কোনও ধরনের রেফারেন্সের উৎস হিসেবে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নামোল্লেখই যথেষ্ট। সুলতান সেলিমের ব্যাপারে জ্ঞান ও তথ্যের সর্বোৎকৃষ্ট এই আকর গ্রন্থটি আমাদের কী বলে তা দেখে নেয়া যাক–

> অতঃপর সিরিয়া ও মিসরের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে সুলতান সেলিমের হাতে এবং তিনি ইসলামের সকল তীর্থভূমির রক্ষক হয়ে যান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি তিনি করেন তা হলো, তিনি সর্বশেষ আব্বাসি খলিফাকে বললেন খেলাফত এবং খেলাফতের বাহ্য দায়িত্বগুলো তার কাছে ন্যস্ত করতে। যেমন নবীজির পবিত্র ঝাণ্ডা , তরবারী ও অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রী হেফাজত করা। এর ফলে উসমানি সাম্রাজ্যের খলিফাগণ যে মর্যাদার অধিকারী হন তা আজও তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্য দিয়ে– খলিফার জন্য কুরাইশ বংশীয় হওয়া আবশ্যক, শর্তটি বেমালুম বিস্মৃতির অতলে বিলীন হয়ে গেলো ।[৫৭]

ইউরোপিয়ান ইতিহাস শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় এবং গ্রহণযোগ্য উৎস হলো ' Historians History of The World'। যেটার কথা পূর্বেও কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। সংকলনটির লেখকেরা একাধিকবার এই ঘটনার বিবরণ পেশ করেছেন।

> সালিম এখন প্রকৃতঅর্থেই পবিত্র স্থানসমূহের রক্ষক হয়ে গেছে। সে কায়রোতে এক অসহায় নির্বোধ শাসকের দেখা

---

৫৬ সফরনামায়ে সাইয়্যিদি আলি, পৃষ্ঠা ৩৩

৫৭ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ১১ম সংস্করণ, খণ্ড ২৪ , পৃষ্ঠা ৬০৬

> পায়; যাকে মুস্তানসির বিল্লাহ নামে ডাকা হতো। যার একমাত্র বৈশিষ্ট্য বা কৃতিত্ব হলো সে আব্বাসি খেলাফতের দ্বিতীয় শাখার আঠারোতম খলিফা । সালিম তার বিষয়ে পদক্ষেপ নিলো। যতক্ষণ পর্যন্ত সে খেলাফাতের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তিত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেয়নি ততোক্ষণ তাকে স্বাধীনতা দেয়নি। এর বদলে সালিম তাকে কিছু নগদ অর্থ প্রদান ও মাসিক ভাতা চালু করেন। ঠিক তখনই সুলতান সালিম তার নামের সাথে 'খলিফা' উপাধি যুক্ত করেন। খলিফা আর কোনো অসহায় বার্ধক্যপীড়িত ব্যক্তি রইলেন না। তিনি এখন অনেক বিশাল ক্ষমতাধর এক সেনাবাহিনীর মালিক হয়ে গেলেন; এক সময় যা ইসলামের গৌরব ছিল। ঐ দিন থেকে ইসলামের কেবল একজন নেতা ছিল; যে রাজনীতিক ও ধর্মীয় সকল বিষয়ের ক্ষমতা রাখতেন। সেই নেতাই কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট। [৫৮]

প্রফেসর ম্যাক্স মুলারকে একজন বিজ্ঞ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ জ্ঞান করা হয়। তিনি ২৫ বছর পূর্বে সস্ত্রীক তুরস্ক ভ্রমণ করেন। যৌথভাবে তারা রচনা করেন 'কনস্টান্টিনোপল ভ্রমণ' নামের বইটি। এই ভ্রমণবৃত্তান্তের দুটো স্থানে অটোমান সাম্রাজ্যের নাম আসে। হেরেম এবং খাজানার বিবরণ। তারা লেখেন –

> খাজানা থেকে বের হতেই তৎসংলগ্ন একটি ছোট মসজিদ দেখা গেলো। যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে নবীজির জুব্বা, ঝাণ্ডা, তরবারি ও কামান। মসনদে আরোহণের সাত বছর অন্তর রমজান মাসে সুলতান সেটা যিয়ারত ও পরিদর্শন করেন। নবীজির জুব্বা পরানো হয় সুলতানকে। মনে করা হয় ঝাণ্ডাটি জনসম্মুখে হাজির করলে সকল মুসলিমের সেই ঝাণ্ডাতলে একত্রিত হওয়া ফরজ। তাই খলিফা ও বাদশাহ হিসেবে সুলতানই কেবল সেটা খুলতে পারেন।[৫৯]

---

[৫৮]হিস্টোরিয়াঙ্গ হিস্টোরি অব দা ওয়ার্ল্ড খণ্ড ২৪, পৃষ্ঠা ৪৪৫/৪৪৬)
[৫৯]কনস্টান্টিনোপল ভ্রমণ, পৃষ্ঠা ৩৬

উৎসবে তৈজসপত্র বের করার দৃশ্য দেখা যায়। সেখানকার আলেম ওলামা ও মুফতিদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো সুলতানের প্রতি। সুলতানকে তারা খলিফা বা নবির স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সম্ভ্রম করতেন।[৬০]

৪০ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে মিস্টার উইলফার্ড ব্লেন্ট সর্ব প্রথম অটোমান সাম্রাজ্যের তাৎপর্য বুঝতে পারেন। তিনি আরবদের বন্ধু সেজে আরবদের মধ্যে গাত্রপ্রীতি ও আরব জাতীয়তাবাদের আগুন উস্কে দেন। আরবদের বলেন খেলাফত তাদের জাতীয় অধিকার এবং এই অধিকার তারা (চাইলে) তুরস্কের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারে। মিস্টার ব্লেন্টের বইটির নাম 'ফিউচার অব ইসলাম' যেটা আকবর হুসাইন ইলাহাবাদী ১৮৮৪ সালে 'ইসলামের ভবিষ্যৎ' নামে অনুবাদ করেন। এই বইয়ে খেলাফতের ব্যাপারে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির বিশদ বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। ব্লেন্ট সাহেব নিজের প্রচণ্ড অটোমান বিদ্বেষ ও মতানৈক্য সত্ত্বেও এই বাস্তবতা অস্বীকার করতে পারেননি যে, উসমানী খেলাফত মুসলিম বিশ্বের একটি সর্ববাদীস্বীকৃত বাস্তবতা। তার বই থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার মতো বহুসংখ্যক উক্তি আমাদের হাতে রয়েছে। আমরা এখানে দুয়েকটা উল্লেখ করছি–

> "অন্য দেশের মুসলমানদের মনেও সুলতানের প্রতি রয়েছে সীমাহীন সম্ভ্রম। বৈষয়িক দেখভালের চেয়ে সুলতানের 'ধর্মীয় নেতা'র ভূমিকাই প্রধান। ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে সুলতান নিজের এই ভূমিকাটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দারুণ ভাবে রক্ষা করেছেন।"[৬১]
>
> "তিউনিসিয়ানদের মনে এ নিয়ে গর্ব ছিল যে আমরা তুর্কিদের অধীনতা থেকে মুক্ত। আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চলের হানাফি শাসকরা ছাড়া সবাই তুরস্কের পক্ষে লড়াকে নিরর্থক ভাবত। কিন্তু এখন খোদ মালেকি মাজহাবের অনুসারীরা যারা কাইরাওয়ানে পূজনীয় ছিলো তারাই সুলতান আব্দুল হামিদের ইশারায় যুদ্ধ করছিল। এটাও জানা যায়, মিসরে সুলতানের যেকোনও ধরনের বিজয়ের আন্দোলনে এদের সম্পৃক্ততা ছিল। হিন্দুস্তানের মুসলমানরা তো প্রকাশ্যেই মসজিদে তাদের জন্য কামিয়াবির

---

[৬০] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৪৬
[৬১] ৬১ পৃষ্ঠা

দুআ করছিল। যে দলটি ইসলামের পুনর্জয়ের দুআ করছিল, তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। তারা আশা করছিল তাদের কাঙ্খিত খলিফা, যিনি তাদের মনোবাসনা অনুযায়ী কাজ করছিলেন এবং ইউরোপকে তুচ্ছজ্ঞান করতেন ও জরুরি ভিত্তিতে ইউরোপের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করে যুদ্ধে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সেই খলিফার নেতৃত্বে তারা জিহাদের ঝাণ্ডা তুলে ধরবেন"।[৬২]

"যে অবস্থার কথা আমি উল্লেখ করলাম তা উলামায়ে কেরামের মধ্যে এতটাই সমাদৃত ছিলো যে, বিগতবছর পার হতেই আমি বিপুল পরিমাণ আলেমের সন্ধান পেলাম, যারা এ ব্যাপারে একমত যে, আব্দুল হামিদই অটোমানদের সর্বশেষ খলিফা"।[৬৩]

রাশিয়ান মুসলিমদের অবস্থা ও অবস্থান, এবং তাদের মধ্যে ইসলাম টিকবে কি টিকবে না এসব নিয়ে মিস্টার ব্লেন্ট বলেন–

তুর্কিস্তান, সাইবেরিয়া ও যেসব দেশ তৎকালীন অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ছিল এবং এখন রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত এসব দেশের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অনুসারী মুসলমানদেরকে যে চেতনা তাদেরকে নিজ মাজহাবের ওপর অটল অবিচল রেখেছিল তা হল, তারা মনে করত, রাশিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চলে আমাদের মাজহাবের ভাইদের বড় একটি জামাত এখনও যুদ্ধরত রয়েছে। আমাদের মাজহাবী ও রুহানী প্রতিনিধিরা এখানকার শাসক। আমাদের ধর্মীয় গৌরবের কেন্দ্রস্থল কনস্টান্টিনোপলে আমাদেরই সুলতান ও খলিফার মসনদ। বসফরাসের মসনদে উপবিষ্ট সেই মহান খলিফার হাতে ইউরোপ-এশিয়া ও বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ"।[৬৪](পৃষ্ঠা ১৩৩)

প্রাচ্য, বিশেষত মুসলিম প্রাচ্যের নাড়িনক্ষত্র প্রফেসর ডেমব্রির চেয়ে ভালো আর কেউ হয়তো জানেন না। তিনি তার বই ফিউচার অব ইসলাম-এর এক জায়গায় লেখেন –

---

৬২ ৬৩ পৃষ্ঠা
৬৩ ৪৭ পৃষ্ঠা
৬৪ প্রাগুক্ত ১৩৬

উৎসবের দিন কনস্টান্টিনোপলে আগত পৃথিবীর বিভিন্ন দর্শনার্থীরা সুলতানের প্রতি যে মনোভাব, বিশ্বাস ও সম্মান প্রদর্শন করেন তা কেবল এই জন্য যে তিনি ইসলামী বিশ্বের খলিফা।[৬৫]

"এটা ঠিক যে মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানের অধিকর্তাগণ সর্বদা নিজেদের মসজিদের দরজায় অটোমান সুলতানের সোনালি নির্দেশমালা ঝুলিয়ে রাখতেন, যাতে প্রতিয়মান হয় নামাজে ইমামতির দায়িত্ব দিয়ে সুলতান তাদেরকে বাধিত করেছেন। এবং তারা শাহী ফরমান ও তোহ্‌ফাগুলো গ্রহণ করতেন সীমাহীন কৃতজ্ঞতায় আনত হয়ে। [৬৬]

মারকুইস অব ওয়েলেসলি, গভর্নর জেনারেল ও হিন্দুস্তানের ভাইসরয় এবং মহিসুরের সুলতানের (টিপু সুলতান) মধ্যে অটোমান শাহের ফরমান সংক্রান্ত যেসব লেখাজোখা হয়েছে তা ইতোমধ্যে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আরও একবার তা বর্ণনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

মারকুইস অব ওয়েলেসলি অটোমান সুলতানের বরাত দিয়ে মহিসুরের সুলতানকে চিঠিতে লেখেন ফরাসিদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে এবং ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে ও সম্প্রীতি গড়ে তুলতে। তিনি বলেন–

সকল ধর্মের দুশমন ও ইসলামের খলিফাকে হত্যার চক্রান্তকারী ফ্রান্সের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছেদ করে তিনি ইসলামের প্রতি তার লালিত আবেগের পরিচয় দিয়েছেন। আমি আশাবাদী, যখন তিনি অটোমান সুলতানের এই চিঠিটা পাঠ করবেন তখন নির্দ্বিধায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন যে ফরাসিরা মুসলমানদের স্বীকৃত খলিফার মর্যাদাহানী ও অসম্মান করেছে।

কনস্টান্টিনোপলে নিয়োজিত সাবেক বিলেতি রাষ্ট্রদূত মিস্টার লেয়ার্ড ১৮৭৭ সালে ১৯ শে জুনে এক সরকারি পত্রে বিলেতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন–

---

[৬৫]ফিউচার অব ইসলাম, ডেমব্রি, পৃষ্ঠা ১৩৪
[৬৬]ফিউচার অব ইসলাম, ডেমব্রি, ১৩৬ পৃ.

সুলতান এশিয়ার পঞ্চম স্তরের শাসক হলেও তিনি ইসলামের খলিফা হিসেবেই সর্বদা গণ্য হবেন। আর এটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে, মুসলমানরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার অন্তিম লড়াইয়ে ইংল্যান্ডকে শত্রু ভেবে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কারণ যেসকল বিপদাপদে তারা আক্রান্ত ছিল, তার জন্য একমাত্র দায়ী মনে করতো ইংল্যান্ডকে।

তুরস্ক ও ইতালির যুদ্ধ যা ইতিহাসে 'ত্রিপোলির যুদ্ধ' হিসেবে খ্যাত। মিস্টার বার্কলে ইংরেজিতে এই যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন এবং তা এখনও বিস্তৃত পরিসরে সমাদৃত রয়েছে। তিনি উল্লিখিত বইটির শুরুতেই সন্ধিচুক্তিতে উপস্থাপিত পয়েন্ট ও শর্তগুলো উল্লেখ করেন যাতে তুরস্ক ও ইতালি উভয় পক্ষই স্বাক্ষর করেছিল। মৌলিকভাবে যে পয়েন্টগুলো উপস্থাপন করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি হলো–

> ত্রিপোলির মুসলমানরা মাজহাব হিসেবে সুলতানের অনুসারী, এবং তারা অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকবে। জুম্মা ও দুই ঈদের নামাজে মসজিদ এবং ঈদগাহগুলো সুলতানের নামে খুতবা পাঠ করতে হবে।

স্যার এডওয়ার্ড ক্রিসি নামক জনৈক ইংরেজ অটোমানদের ইতিহাস বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বইটির নাম –হিস্ট্রি অব অটোমান তুর্কস। সেখানে সালিমের খেলাফত সংক্রান্ত ঘটনার বিবরণ তিনি এভাবে তুলে ধরেন–

> সালিম যখন মিসর বিজয় করেন তখন সেখানকার শাসক ছিল আব্বাসি বংশের এক লোক। সেলিম তাকে বললেন আনুষ্ঠানিকভাবে খেলাফতের দায়িত্ব তাকে ও তার বংশের হাতে ন্যস্ত করতে। উপরন্তু নবীজির বৈষয়িক ব্যবহার্য জিনিসপত্র যথা ঝাণ্ডা মোবারক, তরবারী ও অন্যান্য নববী নিদর্শনের বস্তু হেফাজতের ভার তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন, এতদিন যার দায়িত্বে ছিলেন আব্বাসি খলিফাগণ।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রিন্সিপাল স্যার থিওডোর ম্যারিসন সেসব ইংরেজ কৃতবিদ্যদের অন্যতম যারা হিন্দুস্তানের মুসলিমদের চেতনা ও অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি ভারতের প্রবীণ মুসলিম নেতাদের সংস্পর্শে ছিলেন। ভারতের গৌরবোজ্জ্বল সময়ে তিনি ইসলামের

হিতাকাঙ্খী সংঘের একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন অটোমান সাম্রাজ্যের ব্যাপারে তিনি টাইম ম্যাগাজিনে লেখেন

> সবার আগে ইউরোপবাসীর এটা বুঝে নেওয়া উচিৎ যে, তুরস্কের সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী মুসলিমদের রয়েছে দিলি-মুহাব্বত ও আন্তরকি ভালোবাসা। সুলতানের বৈষয়িক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হবার চিন্তা মুসলিমদের আহত করে। এহেন পরিস্থিতিতে এ কথা বললে ভুল হবে না যে মুসলমানদের অনুচিত এমন দুর্বল শাসককে খলিফা জ্ঞান করা। উচিৎ কি অনুচিত জানা নেই, কিন্তু এটা তো সত্যি যে মুসলমানরা খুব ভালোভাবে জানে, এবং স্বীকারও করে যে, আব্বাসিদের হাত থেকে খেলাফত কীভাবে উসমানের বংশধরদের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু এবিষয়ে পূর্ণ অবগত থাকা সত্ত্বেও তারা নিজস্ব ধ্যান-ধারণায় দ্বিধাহীন-অনড়। নিঃসন্দেহে এতে আমাদের আফসোসের সীমা নেই যে মুসলমানরা কেন এমন ভাবে। কিন্তু সত্যি এটাই যে তারা এমন ধারণাই পোষণ করে থাকে।

নামজাদা প্রাচ্যবিদ প্রফেসর ব্রাউন, প্রাচ্যবাদ ও ইসলামি ইতিহাসে যার সমকক্ষ স্কলার গোটা বিলেতে খুঁজে পাওয়া যাবে না ; তিনি টাইম ম্যাগাজিনে এ ব্যাপারে যা লেখেন তার নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো–

> যে ব্যাপারটা আমাকে খুবই অবাক করে তা হলো, মুহাম্মাদের আনিত ধর্ম যারা অস্বীকার করে, খেলাফতের অধিকারী কে হবে এ নিয়ে তারা কেন নিজেদের বিপুল পরিমাণ সময়-মস্তিষ্ক-অর্থ খরচ করে। ব্যাপারটা এমন হয়ে গেল না যে খৃষ্টানদের পোপ বা ' ধর্মীয় নেতা' কে হবে তার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে মুসলমানরা? উসমান বংশের সুলতানগণ খেলাফতের দাবি এখন করছেন না, বরং সুলতান সালিম ও সুলতান সুলাইমান আজমের সময় থেকেই তো এ দাবি উত্থাপিত হয়ে আসছে। সুতরাং সুলাইমানের ইন্তেকালের পরে মুফতি আবু সউদ যে শোকগাথা রচনা করেন তাতে

স্পষ্টত সুলাইমানকে খলিফাতুল্লাহর উপাধি প্রদান করা হয়েছে। ফরিদুন বে'র সংকলিত সরকারি নথিপত্র থেকে আরো অধিক প্রমাণাদি জানা যেতে পারে।[৬৭]

বিলেতের এমন এক মহান জ্ঞানীর সন্ধান আমরা পাই যিনি এই বাস্তবতা অস্বীকার করেন। তিনি হলেন বিখ্যাত উগ্র মুসলিম (বিদ্বেষী) প্রফেসর মার্গোলিয়ুথ। খলিফার প্রতিনিধিবৃন্দ ও তার মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়ে যায় লন্ডনের অবজারভার পত্রিকায়। এ বিতর্কে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে অংশ নেন আর্থার রিডং। যিনি বিভিন্ন মুসলিম দেশে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জজ হিসেবে অবস্থান করেছিলেন। তিনি এই পত্রিকার ২৮ শে মার্চ (১৯৪০) সংখ্যায় লেখেন-

> "বিজ্ঞ প্রফেসর মিস্টার মার্গোলিয়ুথের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু যেহেতু আমার জীবনের বিশটি সুন্দর বসন্ত কেটেছে মুসলিম দেশগুলোতে, বিচারক হিসেবে ইসলামি আইন তথা শাফেয়ী মাজহাবের প্রয়োগ-পরিচর্যা করে করে, সেই হিসেবে আমার মতামত হলো খলিফার এই দাবি পুরোপুরি ইনসাফপূর্ণ নয় । মুহাম্মাদের স্থলাভিষিক্ত হবার যে দাবি সুলতানের , এবং সেন্ট পিটারের স্থলাভিষিক্ত হবার যে দাবি পোপের দুটোই সমান আলোচনার দাবি রাখে। যদিও অনেকে এই ব্যাপারে দ্বিরুক্তি করবেন না,কিন্তু অনেকেই আছেন যাদের মতভিন্নতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি যে, শিয়ারা হজরত আলি ও তার বংশধর ব্যতীত সব খলিফাকে কাফের মনে করে, এবং মরক্কোর মালেকি মাজহাবের আলাদা খলিফা রয়েছে। একইভাবে জাহিরিয়্যাগণ যেমন নাজদের ওহাবিরাও নিজস্ব খলিফার অনুসরণ করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সানুসিয়াগণ ও ওমান, জানজিবারের খারিজিদেরও স্বনির্বাচিত শাসক রয়েছে। তবে সকল উসমানি তুর্কিরা, আরবের সকল হানাফি সুন্নিরা, অধিকাংশ আরব শাফিঈ হাম্বলি মালেকিরা, তুর্কিদের খেলাফতের প্রাচীন পরিসীমায় অবস্থানরত বাসিন্দাগণ, চীনা মুসলিমরা, রাশিয়ান ও এশিয়ান সুন্নি মুসলিমরা সহ আরো অনেক অঞ্চলের মুসলিমরা উসমানি খেলাফতকে অনুসরণ করে।

---

[৬৭]উপর্যুক্ত তথ্যগুলোর জন্য দেখুন 'মাআরিফ' আগস্ট সংখ্যা ১৯১৯

উল্লিখিত স্বীকৃতিমূলক বক্তব্য ছাড়াও ইউরোপিয়ান পত্রপত্রিকায় এ বিষয়ক নির্বাচিত উক্তিগুলো বিপুল পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। তবে সেগুলো উল্লেখ না করার কারণ হলো, তারা বিজ্ঞ প্রাচ্যবিদদের অন্তর্ভুক্ত নন।

অমুসলিম দেশগুলোর মধ্যে চীনও গুরুত্বপূর্ণ। চীন তিন কোটি মুসলমানের আবাসভূমি। তাদের আকিদার ব্যাপারে মিস্টার রিডেং এর বক্তব্য উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু অবাক করা বিষয় এই যে শতবছর পূর্বেই, সুলতান মহান সুলাইমানের সময়ে অটোমান সাম্রাজ্যের আকিদা মাশরিকে আকসা বা সুদূর প্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। নৌসেনাপতি সাইয়েদি আলি আমাদের সামনে চীনের সে-সকল মুসাফিরদের আখ্যান এভাবে তুলে ধরেন–

> তুর্কি মুসলিম সওদাগররা ইদের দিন যখন চীনের মসজিদে সুলতানের নামে খুতবা পাঠ করতে চাইলো তখন তারা চীনের খাকানদের বললো, 'আমাদের মহান সুলতান মক্কা মুয়াজ্জমা, মদিনা মুনাওয়ারা এবং কাবার কিবলার বাদশাহ, সুতরাং ইদের খুতবায় তার নাম পাঠের অনুমতি দেওয়া হোক।' চীনের খানরা যদিও ভিন্ন মাজহাবের অনুসারী ছিল তথাপি তারা মুসলমানদের আর্জিকে স্বাগত জানালেন এবং অনুমতি দিলেন। শুধু তাই নয়, খতিবকে শাহী জুব্বা পরিয়ে হাতির পিঠে গোটা শহরটা ঘোরালেন। তখন থেকে সেখানকার মসজিদগুলোতে সুলতানের নামে খুতবা পাঠ করে আসা হচ্ছে।[৬৮]

এ সকল ঐতিহাসিক স্বীকারোক্তি ও সুস্পষ্ট বিবরণাদি পেশ করা সত্ত্বেও কারো মনে যদি এ ব্যাপারে সন্দেহ থেকেই যায় তাহলে কুরআনের এই আয়াতটি তার জন্য উদ্ধৃত করতে চাই –
" এরপর তারা কোন কথায় বিশ্বাসস্থাপন করবে?"[৬৯]

---

[৬৮] সফরনামা, সায়্যিদি আলি পৃষ্ঠা ৪৬

[৬৯] আল মুরসালাত– ৫০

আব্বাসি খিলাফতের পতনের পর মুসলিম বিশ্ব একটি অভিভাবকশূন্য সময় পার করে। সারা পৃথিবীতে মুসলিমদের দুর্দশার নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়। ক্রুসেডারদের ক্ষুৎপিপাসা প্রবলতর হতে থাকে। পৃথিবীজুড়ে তারা মুসলিমদের হত্যা করে বেড়ায়। মুসলিম ভূখণ্ডগুলো ছোটো ছোটো প্রদেশ ও অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অনৈক্যের তুমুল তুফান মুসলিমদেরকে শত্রুর সম্মুখে তুচ্ছ খড়কুটায় পরিণত করে। অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যূনতম কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নি মুসলিমরা।

ইতিহাসের এই করুণ মুহূর্তে ইসলাম ও মুসলিম জাহানের মুক্তির জন্য এবং নতুন করে বিশ্বশাসনের জন্য এক অনন্য অভিভাবকের আবির্ভাব ঘটে। যার নাম উসমানি খেলাফত। মুসলিমদের ইতিহাসে যুক্ত হয় আরেকটি সোনালি অধ্যায়। মহা কুচক্রী ক্রুসেডারদের অন্তরে সঞ্চার হয় ত্রাস।

আরব থেকে অনারব পৃথিবীর যে প্রান্তেই কোনো মুসলিম অঞ্চল ক্রুসেডারদের ও খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদীদের নির্যাতনের শিকার হয়েছে সেখানেই তারা ছুঁটে গেছেন। নিজেদের রক্ত দিয়ে সেই অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছেন। লেখকের জাদুকরী বর্ণনায় এসব ইতিহাস যেনো জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বইটির রচয়িতা সাইয়িদ সুলাইমান নদবি রহ.। ভারতীয় উপমহাদেশে বিগত দুই শতকে যে অল্প কয়জন মনীষা সীরাত, ইতিহাসবিদ্যা ও জ্ঞানগবেষণায় অনন্য উচ্চতা স্পর্শ করেছেন এবং সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তাদের অন্যতম তিনি। এমন একটি বই বাংলাভাষায় অনন্য সংযোজন নিঃসন্দেহে।

মুসলিম ও উসমানি খেলাফত
সাইয়িদ সুলাইমান নদবি